জলবায়ু পরিবর্তন:
আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
01-223375908 @dg@doe.gov.bd www.doe.gov.bd

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬



পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত

Published on the occasion of the World Environment Day 2026

প্রধান সম্পাদনা উপদেষ্টা

ড. মো: লুৎফর রহমান — মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্পাদনা উপদেষ্টা

মোঃ জিয়াউল হক — অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক

মোঃ খালেদ হাসান — পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্পাদক

ফেরদৌস আনোয়ার — পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান — পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মিয়া মাহমুদুল হক — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ মাহমুদ হোসেন — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ সামসুজ্জামান সরকার — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
খন্দকার মোঃ তাহাজ্জুত আলী — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
সাবরিন সুলতানা — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
জাওয়াতা আফনান — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
কাজী সুমন — উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান — রিসার্চ অফিসার, পরিবেশ অধিদপ্তর
ড. সাইফুল ইসলাম — সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ শরিফুল হক — সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
এস. এম. শরীফুর রহমান — সিনিয়র কেমিস্ট, পরিবেশ অধিদপ্তর
কাজী নাজমুল মাহমুদ — সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
জি এম তানভীর শরীফ — সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ রুহুল আমীন খান — সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Published by the Director General, Department of Environment

মুদণ

আর, জে প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন : +88-02-223375008, ইমেইল:dg@doe.gov.bd

www.doe.gov.bd ‖ www.facebook.com/doebd

بسم الله الرحمن الرحيم



রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর উদ্যোগে ০৫ জুন যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য-'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা'। এই প্রতিপাদ্যের আলোকে UNEP বিশ্বব্যাপী (Now For Climate)-জলবায়ু রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়- স্লোগানকে সামনে রেখে কার্যকর প্রচারণার মাধ্যমে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বৈশ্বিক বাস্তবতা। এর বিরূপ প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দেশের জনজীবন, জীববৈচিত্র্য ও অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, খাল খননের মাধ্যমে জলাধার সৃষ্টি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সবুজ নগরায়ণ, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলবায়ু ও পরিবেশের সংকট মোকাবিলা করা সরকার বা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুরূহ। এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিষয়। আমার বিশ্বাস, সরকারি ও বেসরকারি খাত, গবেষক, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। আসুন, আমরা সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনসচেতনতার মাধ্যমে একটি সবুজ, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান অভিঘাত আজ বিশ্ববাসীর জন্য এক কঠিন বাস্তবতা। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য "Climate Action" বৈশ্বিক জলবায়ু উদ্যোগকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানিয়েছে।

বর্তমানে জলবায়ু সংকট সমগ্র মানবজাতির জন্য অন্যতম বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপদাহ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, খরা এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় বিশ্বজুড়ে পরিবেশ, অর্থনীতি ও মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে খুবই সামান্য অবদান রাখলেও ভৌগোলিক অবস্থান, উচ্চ জনঘনত্ব এবং জলবায়ু সংবেদনশীল অর্থনীতির কারণে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। Climate Risk Index ২০২৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকির সম্মুখীন। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ও জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমন্বিত ও দূরদর্শী নীতি কাঠামো অনুসরণ করছে। পাশাপাশি উপকূলীয় সুরক্ষা, সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (Nature-based Solutions)-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবেশ রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একইসঙ্গে সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখননের কাজ শুরু হয়েছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষিকে টেকসই, আধুনিক ও জলবায়ু-সহিষ্ণু ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, সবুজ শিল্পায়ন, পরিবেশবান্ধব নগরায়ণ, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গণপরিবহন উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার জোরদার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কার্বন ক্রেডিট ও বৈশ্বিক কার্বন মার্কেটের সম্ভাবনা কাজে লাগাতেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সমন্বিত উদ্যোগ, পরিবেশ সচেতনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে একটি সবুজ, নিরাপদ, বাসযোগ্য ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব, এটাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান



মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের লক্ষ্যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছরের ন্যায় ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি এবং দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে।
এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি *(UNEP)* বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে *"Climate Action"*, যার বাংলা ভাবানুবাদ "জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা" বর্তমান বাস্তবতায় এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমানে, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং বিভিন্ন মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে গত কয়েক দশক ধরে জীবন-জীবিকা, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ এবং সামগ্রিক পরিবেশকে বহুমাত্রিকভাবে প্রভাবিত করছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এই ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার ক্রমাগত বিস্তার, নদীভাঙনের তীব্রতা, কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব দেশের জীববৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি, অর্থনীতি এবং জনজীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। পাশাপাশি, জলবায়ু-উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নীরব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সম্মুখসারির একটি দেশ। এই বাস্তবতায় সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাকে সর্বোচ্চ নীতিগত অগ্রাধিকার প্রদান করছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, আগামী পাঁচ বছরে পঁচিশ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং টেকসই নগরায়ণের মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির অংশ হিসেবে *National Adaptation Plan (NAP) 2023-2050, 3rd Nationally Determined Contribution (NDC 3.0)* প্রণয়ণপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার, জলবায়ু অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, নীতি-সংলাপকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং জাতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগিতা নিশ্চিত কল্পে *"Bangladesh Climate Development Partnership (BCDP)"* গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশে দীর্ঘমেয়াদে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে *"Long-Term Low Emission Development Strategies (LT-LEDS)"* প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের টেকসই ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অংশীদার, বেসরকারি খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। উন্নত দেশগুলোকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির অঙ্গীকার অনুযায়ী জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি নাগরিককে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস, বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারার মাধ্যমে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা সবাই এ প্রয়াসে কার্যকর অবদান রাখতে পারবো।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশ হবে জলবায়ু সহনশীল এ প্রত্যাশা রেখে, আমি এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের সফলতা কামনা করছি।

আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি



প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণ ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৫ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Climate Action', যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা' বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী হয়েছে। বাংলাদেশেও এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কারিগরি সংস্থা IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে মর্মে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারণে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা ১.৫+ সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও তা ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছে, যে কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চলীয় দেশসমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার প্রকোপ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবদাহ, খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়।

দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের UNFCCC-এর আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan of Bangladesh) ২০২৩-২০৫০ প্রণয়ন করেছে, যা দেশের অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করছে। এ পরিকল্পনায় ৮টি (পানি সম্পদ, দুর্যোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নগর এলাকা, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, নীতি-প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা-উদ্ভাবন) অগ্রাধিকার খাতে ১১টি জলবায়ু সংকটাপূর্ণ এলাকায় ২৩টি অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে মোট ১১৩টি অভিযোজন পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমান পরিবেশ-বান্ধব সরকার দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াস, সুচিন্তিত ও সমতা বদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন আবশ্যক। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এমপি এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ অপরিহার্য। প্রতিটি নাগরিক যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবেই আমরা একটি সবুজ, নিরাপদ, টেকসই, বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ দিনে আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাই-আসুন, আমরা পরিবেশ রক্ষায় আরও সচেতন ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ পৃথিবী নিশ্চিত করতে একত্রে কাজ করি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শেখ ফরিদুল ইসলাম, এমপি



সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং ধরিত্রীকে পরিবেশগত অবক্ষয়ের হাত থেকে সুরক্ষা লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Climate Action' যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা', যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং একটি টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

বর্তমান বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এবং দূষণ-এই তিনটি প্রধান পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় একযোগে কাজ করছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এ কারণে মানবজীবন ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেশের কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, সুপেয় পানি সরবরাহ ও জীবিকায় গভীর সংকট সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলোর মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য অন্যতম বড় হুমকি, যা উপকূলীয় অঞ্চলে প্লাবন, ভূমিক্ষয়, নিম্নঅঞ্চল নিমজ্জিত হওয়া এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকা ও পরিবেশে গুরুতর ক্ষতি করছে। বিশ্ব ব্যাংক ও IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট আরও তীব্র হবে। পাশাপাশি নদী ও কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিকে আরও জটিল ও গভীরতর করছে।

জলবায়ু সহনশীল টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩-২০৫০ এবং NDC 3.0 প্রণয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সরকারি তহবিলের মাধ্যমে Climate Change Trust Fund-এর আওতায় একাধিক অভিযোজন (Adaptation) ও প্রশমন (Mitigation) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় বন ও বৃক্ষ তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে কার্বন সঞ্চয় নিরূপণ, REDD+ কৌশলের আওতায় বন পুনরুদ্ধার ও বনায়ন সম্প্রসারণ, এবং কার্বন ক্রেডিট কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, Paris Agreement-এর Article 6-এর আওতায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসঙ্গে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য থেকে জ্বালানি/বিদ্যুৎ উৎপাদনকে আরও কার্যকর করতে বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজ উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করবে।

পরিবেশ সকলের জীবন ও অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজায়নের জন্য গ্রহীত মহাপরিকল্পনা এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে আরও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হবে।

পরিশেষে, আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ রায়হান কাওছার



প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৫ জুন ২০২৬

বাণী

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬' উদযাপিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের স্মরণে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য "Climate Action", যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা'। এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব আজ মানবসভ্যতার জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের অন্যতম হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব ও করণীয় আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিল্প খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং নদী ও জলাভূমি সংরক্ষণে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণের সমন্বিত উদ্যোগই একটি টেকসই, নিরাপদ ও বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হবে।

আসুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আমরা সবাই প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আরও সচেতন, দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ সাইমুম পারভেজ

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ০৫ জুন যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়ে যথাযথ দায়িত্বশীলতা, কার্যকর গণসচেতনতা, নাগরিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Climate Action" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে "জলবায়ু পরিবর্তনঃ আজকের পদক্ষেপ আগামীর নিরাপত্তা"; বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, সুচিন্তিত ও যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন আবশ্যক।

আমরা আনন্দিত অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখা দিয়ে যারা স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মরণিকায় যেসব ছবি ব্যবহৃত হয়েছে সেসব ছবির চিত্রগ্রাহকদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মানিত বিশেষ সহকারী স্মরণিকা উপলক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সবিনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের অভিযোজন ও প্রশমন উদ্যোগকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া স্মরণিকা প্রকাশের বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সহযোগিতা প্রদানকারী সকল সহকর্মীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ স্মরণিকায় প্রকাশিত সকল লেখায় সম্মানিত লেখকদের মতামত, পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ, পরামর্শ একান্তই তাঁদের নিজস্ব।

মোঃ খালেদ হাসান
পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

সূচি

ক্রম	বাংলা প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
০১.	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ড. মোঃ লুৎফর রহমান	০১
০২.	অ্যান্টার্কটিকায় বিশ্ব উষ্ণায়নের চিহ্ন ইনাম আল হক	০৬
০৩.	মনোমুগ্ধকর হাওড়ের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ মোকারম হোসেন	১২
০৪.	২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: বাংলাদেশের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের একটি কৌশলগত রূপরেখা অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত, নওরিন আহসান হাবীব	২৩
০৫.	নদী সুরক্ষায় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও সমন্বয় এস এম আবু হোরায়রা, ড. প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দীন হোসেন	২৫
০৬.	পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু-সহনশীলতা রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের উন্নয়ন অভিযাত্রা মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান, ড. সোনিয়া আফসানা, সুবর্ণা মোশারফ	৩০
০৭.	জলবায়ু সংকট, প্লাস্টিক দূষণ ও বায়ুদূষণের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ প্রফেসর ড. এম. এ. ফারুখ	৩৪
০৮.	প্রাণ প্রকৃতি, পরিবেশ ও মহাবয়ানের ডাক পাভেল পার্থ	৩৭
০৯.	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে অশুভ আত্মা হাসান জাহিদ	৪৩
১০.	টেকসই রাষ্ট্র গঠনে পরিবেশ রক্ষার সমন্বিত মহাপরিকল্পনা এখন সময়ের দাবি অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার	৪৬
১১.	জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সমাধান ও অভিযোজনক্ষমতা: বাংলাদেশ ও কক্সবাজারের বাস্তবতা খন্দকার মাহমুদ পাশা, আফরোজা ইসলাম শশী	৪৯
১২.	প্লাস্টিক মোকাবিলায় বহুমাত্রিক পদক্ষেপ ফাহিম আহম্মেদ মন্ডল	৫১
১৩.	পরিবেশ সুরক্ষায় তরুণদের ভূমিকা আহসান রনি	৫৫
১৪.	শব্দদূষণ ও প্রতিকার মো. বেলায়েত হোসেন	৫৭
১৫.	নীরব ঘাতক প্লাস্টিক: দূষণ রোধে আধুনিক সমাধান ও আমাদের করণীয় সাধন সরকার	৫৯
১৬.	বৃক্ষ কেয়া আক্তার	৬২

Serial	English Article	Page
17.	**Solid Waste Management: An Integrated Approach from Policy to Implementation** Mohammad Navid Safiullah	65
18.	**Climate Finance for a Resilient Bangladesh: Pathways, Progress, and Priorities** Md. Mahmud Hossain	67
19.	**Carbon Markets and Climate Action: Unlocking Climate Finance for Low-Carbon and Resilient Development in Bangladesh** Md. Harun-or-Rashid	76
20.	**Government Initiatives for Sustainable Tourism Development in Bangladesh** Dr. Md. Anowar Hossain Bhuiyan, Manzuma Sharmin Munne	91
21.	**Biodiversity Conservation Efforts in Bangladesh in line with Global Commitment** Mst. Papia Sultana	96
22.	**Comfort Today, Crisis Tomorrow** Ratul Ghosh, Akib Ahmed Talukder	100
23.	**Climate Change: A Silent Threat to Human Health** Kazi Nazmul Mahmud	106
24.	**Climate Resilient City: Building a Walking and Cycling Friendly Dhaka** Naima Akter	108
25.	**River Health and the Imperative for Integrated River Basin Management in Bangladesh** Nazmun Naher	113
26.	**Save the River Meghna Before It's Too Late** Tasnuva Tasneem Soha	116
27.	**Drowning in Plastic: Bangladesh's Fight to Save its Rivers and Sea** Sudha Barua	119
	আলোকচিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১২৫-১৩৯

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

ড. মো: লুৎফর রহমান*

ভূমিকা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া, যার সূচনা প্রাকৃতিক কারণে হলেও শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর তা বহুগুণে ত্বরান্বিত হয়। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়, যার ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড *(CO_2)* সহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীর তাপ আটকে রেখে গ্রিনহাউস প্রভাবকে তীব্রতর করে এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের গতি আরও ত্বরান্বিত করে। এই ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসেবে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত *Earth Summit* (ধরিত্রি সম্মেলন) এ *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* গৃহীত হয় যার লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করা। পরবর্তীতে এই কাঠামোর অধীনে ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে Kyoto Protocol গৃহীত হয় যা ২০০৫ সালে কার্যকর হয়। এটি মূলত *UNFCCC* এর *"Common but differentiated responsibilities and respective capabilities"* নীতির ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলোর ওপর গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয় যে, কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলোর উদ্যোগে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত *COP21* এ *Paris Agreement* গৃহীত হয় এবং ২০১৬ সালে কার্যকর হয়। এই *Agreement* সকল দেশকে নিজস্ব জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান *(NDCs)* নির্ধারণের মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এবং সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, পরিবেশ সংরক্ষণে বৈশ্বিক সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের মানব পরিবেশের উপর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আলোকে ১৯৭২ সালে *United Nations Environment Programme (UNEP)* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি *UNEP* এর উদ্যোগে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি *(United Nations Environment Programme)* কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হচ্ছে *"Climate Action"* যার ভাবার্থ হচ্ছে 'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা'।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রভাব

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ, যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারনে বৈশ্বিক জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কারিগরি সংস্থা *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* এর সর্বশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক *Sixth Assessment Report (AR6)* এ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশসহ উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের দেশসমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বর্ধিত হারে ও অধিক তীব্রতায় দেখা দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে খুব দ্রুত ও ব্যাপক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দুই দশকের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লব সময়ের পূর্বের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে, যা ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতি ভগ্নাংশ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আবহাওয়া দিনকে দিন আরও বিপজ্জনক আচরণ করবে-সামুদ্রিক ঝড় বেশি হবে, জলোচ্ছ্বাস বাড়বে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (*Sea Level Rise - SLR*) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এটি উপকূলীয় অঞ্চলে প্লাবন, ভাঙন এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশসহ নানা উপায়ে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের নিচু ও সমতল ভৌগোলিক গঠন উপকূলীয় অঞ্চলকে এই ঝুঁকির প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তুলেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি গবেষণা *"Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts"* অনুযায়ী, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ৩.৮-৫.৮ মিমি/বছর। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, এই শতাব্দীর মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% প্লাবিত হতে পারে।

একইসাথে, শুধুমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই দেশে ধান উৎপাদন ৫.৮%-৯.১% হ্রাস পেতে পারে। *IPCC* এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন *(AR6)* অনুযায়ী, বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অগভীর ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রায় ২৬ মিলিয়ন মানুষ অত্যধিক লবণাক্ততার ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০১২ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠাপানির নদী এলাকার পরিমাণ ৪০.৮% থেকে কমে ১৭.১%-এ নেমে আসতে পারে। *Asian Development Bank (ADB)*-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন *Asia Pacific Climate Report 2024* অনুযায়ী, বর্তমান জলবায়ু পরিস্থিতিতে, এমনকি আশাব্যঞ্জক প্রশমন প্রচেষ্টার মধ্যেও জিডিপি ক্ষতি উল্লেখযোগ্য থাকবে। উচ্চ নিঃসরণ পরিস্থিতি *(SSP5-8.5)* অনুযায়ী ২১০০ সালে জিডিপি প্রায় ৭৭.৯% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। তুলনামূলক আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি *(RCP4.5)*, যেখানে উষ্ণতা প্রায় ২.৭°$\pm$*C* বৃদ্ধি পায়, সেখানে জিডিপি ক্ষতি হতে পারে ৪১.১% এবং অত্যন্ত কঠোর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি *(RCP2.6)*, যেখানে উষ্ণতা *2°*$\pm$*C* -এর নিচে রাখা সম্ভব, সেখানেও বাংলাদেশের জিডিপি ২৪.৫% হ্রাস পেতে পারে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা *(National Adaptation Plan, 2023-2050)* অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১৯.৯ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে বা জলবায়ু অভিবাসীতে পরিণত হতে পারে।

বাংলাদেশের অভিযোজন ও প্রশমন উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান নিতান্তই নগণ্য (০.৪৮% এর কম)। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজনে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে।

(ক) *National Adaptation Plan (NAP)*

বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*-এর আওতায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বা *National Adaptation Plan (NAP) (2023-2050)* প্রণয়ন করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০-এর ভিশন হচ্ছে "বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তরান্বিত করতে সক্ষম কার্যকর অভিযোজন নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জলবায়ু-সহিষ্ণু জাতি গঠন।" *NAP* দেশের অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করছে। NAP-এ ৮টি অগ্রাধিকার খাতে ১১টি জলবায়ু সংকটাপূর্ণ এলাকায় ২৩টি অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্যে প্রাথমিকভাবে ৯০টি *high-priority* ও ২৩টি *moderate-priority* সহ মোট মোট ১১৩টি অভিযোজন পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে। *NAP* এর অগ্রাধিকার খাতগুলো হলো- *(i) Water Resources (ii) Disaster, Social Safety and Security (iii) Agriculture (iv) Fisheries, Aquaculture & Livestock (v) Urban Areas (vi) Ecosystem, Wetlands & Biodiversity (vii) Policies & Institutions (viii) Capacity Development, Research and Innovation. NAP*-এ চিহ্নিত অভিযোজন পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ২৭ বছরে মোট ২৩০ বিলিয়ন ডলার (প্রায়) অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। বর্তমানে *NAP* বাস্তবায়নের লক্ষ্যে *ADB*-এর সহায়তায় *NAP Investment Roadmap* প্রণয়ন করা হচ্ছে।

(খ) *Nationally Determined Contribution (NDC)*

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে *UNFCCC*- তে *Nationally Determined Contribution (NDC)* দাখিল করে আসছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে *Intended Nationally Determined Contribution (INDC)* এবং ২০২১ সালে *Updated Nationally Determined Contribution (NDC 2.0)* এবং সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ *Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0)* দাখিল করেছে। *NDC 3.0* অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে শর্তহীন *(unconditional)* ভাবে নিজস্ব সক্ষমতায় ৬.৩৯% গ্রীন হাউস গ্যাস বা ২৬.৭৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমতুল্য কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস করবে এবং শর্তযুক্ত *(conditional)* ভাবে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৩.৯২% গ্রীন হাউস গ্যাস বা ৫৮.২৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমতুল্য কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস করবে। *NDC 3.0* এর প্রশমন *(mitigation)* কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রায় ১১৬.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ সরকার শর্তহীন *(unconditional)* কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ২৫.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যবহারের অঙ্গীকার করেছে। পাশাপাশি শর্তযুক্ত *(conditional)* কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য দেশের অতিরিক্ত ৯০.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন হবে।

NDC-তে উল্লিখিত মিটিগেশন টার্গেটসমূহ বাংলাদেশ সরকারের *Allocation of Business* অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী স্বল্প কার্বন নিঃসরণের কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে *Long Term Low Emission Development Strategies (LT-LEDS)* প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

(গ) *Bangladesh Climate Development Partnership (BCDP)*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর উন্নয়ন অংশীদারগণ *(Development partners)* বিগত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত *COP28*-এ বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ *(BCDP)* চালু করে। *BCDP*-এর অধীনে চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে: *WG 1: Climate Finance (Domestic), WG 2: Climate Finance (External), WG 3: Policy, Knowledge, and Capacity Building, Ges WG 4: Project Development Support, Monitoring, and Evaluation.* এই গ্রুপগুলো জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহ, নীতিগত সংস্কার ত্বরান্বিত করা এবং উদ্ভাবনী জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে। এর কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বিতভাবে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২৯ মে ২০২৪ তারিখে *BCDP* বোর্ড গঠন করা হয়, যা ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে পুনর্গঠিত হয়।

(ঘ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০২৫

বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি সমন্বিত ও উচ্চাভিলাষী নীতি কাঠামো অনুসরণ করছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০২৫-এ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে একটি টেকসই ও নিম্ন-কার্বন জ্বালানি ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০২৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উৎপাদনে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায়, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আলোচনাক্রমে তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান *(NDC 3.0)*-এ ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২৫% নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য সোলার, উইন্ড, বায়োগ্যাস ও ওয়েস্ট-টু-এনার্জি এবং গ্রিড আধুনিকায়ন সংশিষ্ট সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ

সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার জোরদার করা হচ্ছে এবং এ খাতের সম্প্রসারণ ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। অফ-গ্রিড এলাকায় ইতোমধ্যে ৬০ লক্ষেরও বেশি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের প্রায় ১২% জনগণের জন্য পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, সারা দেশে ১৪টি সোলার পার্ক, ২৮টি সোলার মিনি-গ্রিড, ৩,৫২৪টি সৌর সেচ পাম্প, ৪,৭৮২টি রুফটপ সোলার সিস্টেম এবং ১১৬টি সৌরচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি অবকাঠামোর এ বিস্তার অব্যাহত রয়েছে এবং সংশিষ্ট স্থাপনাগুলোর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(চ) কর অবকাশ ও প্রণোদনা

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে যে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পসমূহকে ১৫ বছরের কর অবকাশ *(tax exemption)* সুবিধা প্রদান করা হবে। এসব প্রকল্প প্রথম দশ বছর ১০০% কর অব্যাহতি, পরবর্তী তিন বছর ৫০% এবং তার পরবর্তী দুই বছর ২৫% কর অব্যাহতি সুবিধ ভোগ করবে। যে সকল নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন ১ জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০৩০ সালের মধ্যে শুরু হবে সে সকল নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এই কর অবকাশ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

সম্প্রতি সরকার যোগাযোগ খাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে ইলেকট্রিক গাড়ীর উপর কর হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে আরও সুস্পষ্ট হবে।

(ছ) *Montreal Protocol* এর আওতায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাস

বাংলাদেশ ০৮ জুন ২০২০ তারিখে *Kigali Amendment* অনুমোদন করেছে এবং ২০৪৫ সালের মধ্যে *HFC* ৮০% হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। *HPMP (HCFC Phase-out Management Plan)* স্টেজ-*II*-এর বিনিয়োগ অংশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ *HCFC*-ভিত্তিক গৃহস্থালী এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন থেকে *1,730,798 tCO_2e* নিঃসরণ এড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং ১.৫ টন রেফ্রিজারেশন *(TR)* ক্ষমতা পর্যন্ত ইউনিটে *HC* প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে।

(জ) কার্বন মার্কেট ও *Article* ৬ বাস্তবায়ন

কার্বন মার্কেটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো *UNFCCC* এর আওতায় গৃহীত *Paris Agreement-Gi Article 6*-এর অধীনে *Designated National Authority (DNA)* গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে একটি গভর্নিং বোর্ড, একটি টেকনিক্যাল কমিটি এবং একটি *DNA* সেক্রেটারিয়েট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ *Bangladesh Carbon Market Framework* প্রণয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারে অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতঃপূর্বে *Kyoto Protocol-Gi Clean Development Mechanism (CDM)*-এর আওতায় বাংলাদেশে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে *Paris Agreement*-এর *Article 6* -এর আওতায় আরও ১০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে *DNA* কর্তৃক *Letter of Endorsement (LoE)* প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফলে এটা প্রতীয়মান যে, আন্তর্জাতিক বাজারে কার্বন ক্রেডিট বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সঠিক নীতি, স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ কার্বন মার্কেট থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারবে। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে কার্বন নিঃসরণের প্রধান তিনটি খাত (জ্বালানি, কৃষি, বর্জ্য) এবং পূনঃবনায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রিয়ভাবে মেজারমেন্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন (এমআরভি) সিস্টেম গঠন করে দেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্বন মার্কেট গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

এছাড়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কার্বন বাণিজ্য বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ইতোমধ্যে জাপানের সাথে *Joint Crediting Mechanism (JCM)* এর আওতায় ৪টি নবায়নযোগ্য/বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত এবং ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জলবায়ু অর্থায়ন: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

ক. অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অর্থায়ন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশে সমন্বিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড *(BCCTF)* গঠন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনকারী প্রথম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত এ তহবিলে প্রায় ৪৩৩৬.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের আওতায় *BCCTF* কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় এর কৌশলগত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১,০০০ টিরও অধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম আরও জোরদার হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গুরুতর ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে তার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করছে এবং প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করছে। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে *Climate Fiscal Framework (CFF)* গ্রহণ করে এবং ২০২০ সালে তা হালনাগাদ করে, যাতে জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক *Public Financial Management (PFM)* ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে জলবায়ু-সম্পর্কিত বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৫১.৮১% । এর মধ্যে ১০.০৭% সরাসরি জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত। গত পাঁচ বছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ৪৭.১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট ছিল ২৮,০১০.১১ কোটি টাকা (প্রায় ২.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪১,২০৮.৯৭ কোটি টাকায় (প্রায় ৩.৪০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) উন্নীত হয়েছে।

খ. আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন

জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ *UNFCCC*-এর অধীনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা পেয়ে আসছে। *UNFCCC*-এর সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তহবিল যেমন: *Global Environment Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), Least Developed Countries Fund (LDCF), Adaptation Fund (AF)* ইত্যাদি হতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

অনুদান *(small-grants window)*, বিভিন্ন *access modality,* এবং *Santiago Network*-এর সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। *COP30*-এ জলবায়ু পরিবর্তনকে মানবজাতির একটি অভিন্ন উদ্বেগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মানবাধিকার, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। *NDC, NAP* এবং *Long-Term Low Emissions Development Strategy (LT-LEDS)*-এ *Just Transition Pathways* অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, কারিগরি সহায়তা ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটি *Just Transition Mechanism* গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যার কার্যক্রম ২০২৬ সালের মধ্যে *operationalize* করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফান্ড	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অর্থায়নের পরিমান (মিলিয়ন ইউএসডি)	
		গ্র্যান্ট	লোন
*Green Climate Fund (GCF)**	৭	১৬৮.৩০	২৫০.০০
Least Developed Countries Fund (LDCF)	৭	৩৪.৪১	-
Adaptation Fund (AF)	২	১৯.৯৯	-
*Global Environment Facility (GEF)***	৮	২৪.৬৬	-
		মোট: ২৪৭.৩৬	২৫০.০০

* শুধুমাত্র জাতীয় প্রকল্প বিবেচনায় নেয়া হয়েছে (এছাড়াও আরো ৩টি আঞ্চলিক প্রকল্প রয়েছে)।
** শুধুমাত্র *Climate Change* থিমেটিক এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেবল জাতীয় উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। উন্নত দেশগুলোর অধিক গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং ঐতিহাসিক দায় বিবেচনায় তাদের আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিত না হলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা কঠিন হবে। জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা সময়ের দাবি। এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা, প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। নগরায়নের ক্ষেত্রে সবুজ অবকাঠামো, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং তাপদ্বীপ *(heat island)* প্রভাব কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিটি-ভিত্তিক অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসমাজের সম্পৃক্ততা এবং পরিবেশ শিক্ষা জলবায়ু মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ভবিষ্যতের জন্য আমাদের করণীয় সুস্পষ্ট। জলবায়ু বিষয়কে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে জলবায়ু অর্থায়নের নতুন উৎস অনুসন্ধান এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত উপায়ে অভিযোজনের মাধ্যমে এহেন সম্ভাব্য দুর্দশা থেকে দেশের উত্তরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত বর্ধিত জলবায়ু অর্থায়ন সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ তাই একান্ত জরুরী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগকে আরও জোরদার করবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি এই উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার আয়োজন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা অনুষ্ঠান এবং চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে পরিবেশ মেলার আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে দূষণমুক্ত ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নে সরকার এককভাবে নয়, বরং সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি, তরুণ সমাজ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, প্রাইভেট সেক্টর, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সম্মিলিত উদ্যোগ, দায়িত্বশীল আচরণ এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, জলবায়ু সহনশীল ও বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলব বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

*** মহাপরিচালক,** পরিবেশ অধিদপ্তর

অ্যান্টার্কটিকায় বিশ্ব উষ্ণায়নের চিহ্ন

ইনাম আল হক*

বছর দেড়েক আগে আমরা অনেকে মিলে বাংলাদেশ থেকে অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম। এর আগেও একবার অ্যান্টার্কটিকা যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলায় আমার এই দুই সফরের মধ্যে ২৭ বছরের ব্যবধান। এই সাতাশ বছরে অ্যান্টার্কটিকার বড় কোন পরিবর্তন হয়েছে কি। অ্যান্টার্কটিকার মতো মানুষের বসতিহীন একটি ভূখণ্ডে এত অল্প সময়ে বড় কোন পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আসলে বড় বড় অনেক পরিবর্তনই আমার চোখে পড়েছে। ও সব পরিবর্তনের অর্থ কী তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম সফরে আমাদের জাহাজটিকে অধিকাংশ সময় ভাসমান বরফের অতিকায় টুকরোর ফাঁকফোঁকর দিয়ে সাবধানে চলতে হয়েছিল। আমাদের সেই জাহাজের নাম ছিল 'এক্সপ্লোরার'। আমার মনে আছে, সেই সফরে দুমদাম করে জাহাজের গায়ে বরফের টুকরোর ঘা লাগত সারাক্ষণ। নানা ধরণের নাম ছিল ভাসমান সেই বরফের, যেমন: প্যাক-আইস, প্যানকেক-আইস, সী-আইস, প্রেসিয়াল-আইস, আইস-ক্রো, আইস-ফিল্ড ইত্যাদি। সে সফরের 'বরফ-বিশেষজ্ঞ' নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন যে জাহাজের নাবিকেরা ভাসমান বরফকে যমের মতো ভয় পান। নাবিকের সেই ভয়ভীতি ভিত্তিহীন ছিল না মোটেও। আমাদের সেই ভ্রমণের ঠিক ১০ বছর পর একটি ভাসমান বরফের যা খেয়ে 'এক্সপ্লোরার' ডুবে গিয়েছিল এবং হেলিকপ্টার দিয়ে যাত্রী ও নাবিকদের উদ্ধার করতে হয়েছিল।

সেই ভয়াবহ ভাসমান বরফের কথা আমি অনেক সহযাত্রীকেই বলেছিলাম আমার দ্বিতীয় সফরে এসে। কিন্তু এই সফরে আমাদের জাহাজের গায়ে একবারও কোন বরফের ধাক্কা লাগল না। অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার পাশে ভাসমান বরফের দেখা মিলল অতি সামান্যই। এ। সফরে আমাদের জাহাজ ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পূর্বদিকে 'দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপ' পার হয়ে ক্রমাগত দক্ষিণপশ্চিমে নেমে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের প্রান্তে চলে এল। পুরোটা সময় একবারও জাহাজটিকে কোথাও বরফের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে হল না। আমি ঘস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আবার একটু দুশ্চিন্তাও করলাম। ২৭ বছর আগের সফরে হিমৈশলির ভয়াবহতা নিয়ে আমি বানিয়ে গল্প বলেছি বলে মনে করছেন না তো আমার সহযাত্রীরা!

আমার দুশ্চিন্তা গভীরতর হল যখন এই সফরের 'বরফ-বিশেষজ্ঞ' বললেন, বিজ্ঞানীদের হিসেবমতে বিশ্ব উষ্ণায়নের অমোঘ প্রভাবে গত বিশ বছরে বিশ্বের ভাসমান বরফ হ্রাস পেয়েছে ১০-১৫%। শুধু যে ভাসমান বরফই কমেছে তা নয়, এই সফরে অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার উপকূলে ও পাহাড়েও আগের তুলনায় বরফ দেখেছি । এবার তাই 'ডিসেপশন আইল্যান্ড' বা 'প্রতারণা দ্বীপ' নামের সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে আমাদের আরোহণ সম্ভব হল কোনো বরফে পা না রেখেই। সাতাশ বছর আগে এটা সম্ভব হয়নি মোটেই।

আমার মনে আছে, আগে পাহাড়ের ঢালে অনেক বরফ জমে ছিল যদিও এই দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটি কিঞ্চিৎ সক্রিয় ছিল বলে সৈকতের পানি গরম আর বাতাসে গন্ধকের কড়া গন্ধ ছিল। এবার দেখলাম, আগ্নেয়গিরিটি আগের মত সক্রিয় নেই বলে বাতাস গন্ধমুক্ত ও সৈকতের পানি শীতল হয়ে গেছে। আগ্নেয়গিরি সক্রিয় নেই বলে তো পাহাড়ের গায়ে আগের চেয়ে বেশী বরফ জমে থাকার কথা। কিন্তু আসলে আমি আগের চেয়ে অনেক কম বরফ দেখতে পাচ্ছি।

এই সফরে অ্যান্টার্কটিক মহাসাগরের পানিতে যতবার চোখ রেখেছি এবং পেনিনসুলার জমিনে যতবার পা রেখেছি ততবার মনে হয়েছে, ২৭ বছরের মধ্যে এখানে বরফ অনেক, অনেক কমে গেছে। সাতাশ বছর আগে দেখেছি বরফগলা পানি থেকে ডিম বাঁচানোর জন্য পেঙ্গুইন পাখিরা নুড়ির স্তুপ গড়ে তার ওপর বাসা করেছে। এবার দেখি পেঙ্গুইনগুলো সবখানে দিব্যি মাটিতেই বাসা করে ডিমে তা দিচ্ছে; ওদের যেন বরফের কোন ভয়ই আর নেই। বরফ আরও কমে গেলে ওদের বাসা করা সহজতর হবে বটে; কিন্তু অনেক বড় ব্যাঘাত ঘটবে অধিকাংশ পেঙ্গুইন পাখির জীবনযাত্রায়। তার চেয়ে বেশী ব্যাহত হবে মানুষের জীবনযাত্রা, বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষের যাদের বসবাস সমুদ্রপোকূলে। মানুষের জীবনে বিশ্ব উষ্ণায়নের ঝুঁকি আর বাংলাদেশের বাড়তি ভালনারেবিলিটির কথাটি আমার বারবার মনে এসেছে দ্বিতীয়বার অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণে গিয়ে। আমার ম্রিয়মাণ মুখ সম্ভবত আমার সহযাত্রীদের জন্য কিঞ্চিৎ শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁদের কাছে বলতে শুরু করেছিলাম ২৭ বছর পরে অ্যান্টার্কটিকায় আমি ইতিবাচক কী পেয়েছি সেই সব কথা।

ইতিবাচক বিষয়ও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। তাই আমাকে বানিয়ে কিছুই বলতে হয়নি। আমার প্রথম সফরে মাত্র তিনটে 'হাম্পব্যাক হোয়েল' বা 'কুঁজো তিমি' দেখতে পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় সফরে কুঁজো তিমি দেখলাম তিরিশটিরও বেশী। তিমিগুলো আগের চেয়ে অনেকটা নির্ভীক হয়েছে বলেও অনুমান করা যায়। কুঁজো তিমি ছাড়াও বেশ কয়েকটি 'অর্কা' বা 'কিলার হোয়েল' দেখলাম যার একটিও প্রথম সফরে আমি দেখতে পাইনি।

অর্কাকে বাংলায় 'খুনি তিমি' বলা হয়েছে যদিও প্রাণীটি আসলে অতিকায় এক শুশুক; খুনিও নয়, তিমিও নয়। তিমি শিকার নিরোধে কার্যকর কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ফলেই গত ৩০ বছরে কুঁজো তিমির মতো কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসাগরে। যদিও বিশ উষ্ণায়নের ফলে সামুদ্রিক বরফের ওপর নির্ভরশীল অনেক প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর সংখ্যা কমেই চলেছে শঙ্কাজনক গতিতে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আমাদের বড় সমস্যা হল এই যে এর সঠিক চিত্র তুলে ধরলে লোকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আবার একে ধামাচাপা দিয়ে রাখলেও আমদের নিস্তার নেই। সমস্যার কথা না বললে তো মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হবে না কেউ। তাতে আমাদের বিপদ বেশী বই কম হবে না।



১৯৯৭ সালে প্রতারণা দ্বীপে



২০২৪ সালে প্রতারণা দ্বীপে



১৯৯৭ সালে নুড়ির বাসায় জেন্টু পেঙ্গুইন



২০২৪ সালে বরফহীন সৈকতে জেন্টু পেঙ্গুইন



ডিঙ্গির পাশে কুঁজো তিমির বহর



অ্যান্টার্কটিকার পানিতে খুনি তিমি

*বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, পর্যটক, আলোকচিত্রী ও পাখি বিশেষজ্ঞ

মনোমুগ্ধকর হাওড়ের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ

মোকারম হোসেন*

কয়েকবছর ধরে শুকনো মৌসুমে নানান গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই টাঙ্গুয়ার হাওড়ে। সোলেমানপুর বাজার থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় প্রায় ঘন্টাদেড়েক চলার পর টুকরো টুকরো হিজলের বন, নদীর পাড় আর হাওড়ের কিনারা বা কান্দাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। যেতে যেতে একটি হিজলের বনে থামি। হুড়হুড়ি আর ঘাগরার পাশে খুঁজে পাই বন-গোলাপের একটি ছোট্ট ঝোপ। পাশেই দুধিয়ালতা আর শতমূলীর ঝাড়। হাটতে হাটতে আরো অনেকগুলো বন-গোলাপ খুঁজে পেলাম। হাতের কাছে দুটো ঝোপের একটি ফুল ভরতি, অন্যটিতে একটি মাত্র ফুল। ছবি তুলে নৌকায় ফিরি। আবার চলতে শুরু করে নৌকা। এবার বুনো স্ট্রবেরি খুঁজে বের করতে হবে।

শুকনো মৌসুমে বিলের ভেতর নৌকা নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। তাই থামতে হলো। নৌকা রেখে হাঁটতে শুরু করি। হাওড়ের এদিকটা বেশ নির্জন। হিজল, করচ, বরুণের দীর্ঘ সারি। পাশেই ঢালু অংশে বিচিত্র লতাগুল্মের ঠাস বুনন। সে দিকে চোখ রেখেই এগুতে হবে। একসময় পেয়ে যাই দুর্লভ বুনো স্ট্রবেরির ফুল ও ফল। এই উন্মোচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো, গোলাপ এবং স্ট্রবেরি ভিনদেশি নয়, আমাদের সঙ্গেও এই দুই উদ্ভিদের শেকড়ের সংযোগ রয়েছে। হাওড়জুড়ে এমন অসংখ্য উদ্ভিদ, তৃণ-লতা-গুল্ম ছড়িয়ে আছে। যার মধ্যে কোনো কোনোটি অতি বিপন্ন এবং দুর্লভ। বর্ষায় পানির নিচে ডুবেথাকা হাওড়ের ঢালুতে পানি শুকিয়ে যাবার এসব উদ্ভিদ জেগে ওঠে। আর কিছু জন্মে অগভীর পানিতে। কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রায় ৬ মাস পানির নিচে জীবন্ত অবস্থায় ডুবে থাকে। পানি সরে যাবার পর আবার নব উদ্যমে তাতে প্রাণসঞ্চার ঘটে। হাওড়ের মণি-মুক্তোসম এমন কিছু উদ্ভিদ নিয়েই এই লেখা।



হাওড়ের এমন অপার্থিব সৌন্দর্যে অবগাহন করে কাটিয়ে দেয়া যায় দিনের পর দিন

১. হাওড়ের জল গোলাপ

প্রায় ষোলো বছর আগে প্রথম যখন টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যাই, তখন মাঝির কাছে শুনেছিলাম পানির নিচে লুকিয়ে থাকা এক রহস্যময় গোলাপ ফুলের কথা। মাঝি দূরে থিকথিকে কাদাজলমাখা একটি জায়গা দেখিয়ে বলেছিলেন, মাসখানেক পর জায়গাটা শুকিয়ে গেলে ওখানেই ফুটবে এই ফুল। সেই ফুল দেখতে দুই বছর পর শুকনো মৌসুমে আরেকবার হাজির হয়েছিলাম হাওরে। এপ্রিলে নদীর পানি শুকিয়ে যায়।

তাহিরপুর থেকে মোটরবাইকে চেপে সোলেমানপুর বাজারে এসে সেখান থেকে নৌকা পাওয়া গেল। হিজল বনে নৌকা থামিয়ে কয়েক মাইল ভেতরে ঢুকলাম। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। হাওড়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তৃণ-বীরুৎ, লতা-গুল্মের সমারোহ। বছরের সিংহভাগ সময় এই প্রান্তর ডুবে থাকে পানির নিচে। প্রায় হাঁটুসমান লম্বা ঘাস মাড়িয়ে যেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, সেখান-কার একটি ঝোপে দৃষ্টি আটকে গেল। দেখতে অবিকল গোলাপগাছ! প্রথমে ভাবলাম ভুল দেখছি। আশপাশে তাকিয়ে দেখি আরও কয়েকটি। বিস্মিত আমি। শুকিয়ে যাওয়া হাওড়ের তলদেশে গোলাপগাছ! আশপাশে দেখা পেলাম দেখা পেলাম আরও কয়েকটি গাছের। গাছজুড়ে দুধিয়ালতার বিস্তার। দুই গাছে সাকল্যে দুটি ফুল পাওয়া গেল।

একটি তরতাজা। অন্যটির একটি পাপড়ি নেই। পরের বছরগুলোতে চুলচেরা হিসাব মিলিয়ে সঠিক সময়ে হাওড়ে গিয়েছি। মন ভরে দেখেছি গোলাপের রূপ। অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে অনেক দূর অবধি। গোলাবাড়ি ক্যাম্প ছাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ঘেঁষে প্রায় দুই মাইলের মতো পায়ে হাঁটা পথ। দুই পাশে হিজল-করচ-বরুণের পাশাপাশি অসংখ্য তৃণ-গুল্মের ঠাসবুনন। সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে বুনো গোলাপের ঝাড়। এত দিন জানতাম, যে গোলাপ নিয়ে পৃথিবী এত মাতোয়ারা, সেই স্বর্গীয় ফুলের ঐতিহ্যে আমাদের কোনো হিস্যা নেই। হাওড়ের এই বুনো গোলাপ সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছে। ধারণা করা হয়, এটিই পৃথিবীর একমাত্র জলসহিষ্ণু গোলাপ। বছরের দীর্ঘ সময় এই গাছ পানির নিচে ডুবে থাকে। পানি সরে গেলে শুকনো মাটিতে ধীরে ধীরে নতুন পাতা ও ফুলের কুঁড়ি গজাতে শুরু করে। পাপড়ি মেলে ফুল।

তবে গাছটি এখন বিপন্ন। একসময় টাঙ্গুয়ার হাওড় ছাড়া নেত্রকোনা জেলার হাওড়াঞ্চলেও দেখা যেত। বুনো গোলাপটির স্থানীয় নাম সেঁউতি। এটি বলিষ্ঠ ধরনের ঝোপালো গুল্ম। খাড়া বা অর্ধআরোহী ধনুকের মতো শাখা-প্রশাখাযুক্ত। চ্যাপ্টা কাঁটা উপপত্রের জোড়ায় থাকে। পাতা ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতা ও ডালপালা রোমশ বা মসৃণও হতে পারে। ফুল বৃন্তযুক্ত, মঞ্জরিদণ্ড বলিষ্ঠ, পত্র থেকে অনেক ছোট, মঞ্জরিপত্র দেড় সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ঘনভাবে ক্ষুদ্র কোমল রোমাবৃত। বৃতিনল গোলাকার। পাপড়ির সংখ্যা পাঁচ, রং সাদা, ১ দশমিক ৭ থেকে ৩ সেন্টিমিটার লম্বা, প্রশস্তভাবে বিডিম্বাকার, শীর্ষ সখাঁজ ও মসৃণ। পুংকেশর অসংখ্য, গর্ভদণ্ড মুক্ত। ফল ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার লম্বা। ফুল ও ফলের মৌসুম ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। বৈজ্ঞানিক নাম *Rosa clinophylla*



হাওড়ের বেঙ্গল রোজ বা জল গোলাপ

২. বুনো স্ট্রবেরি

কিভাবে বুনোস্ট্রবেরি খুঁজে পেলাম সে সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন। প্রথমেই আমরা গেলাম হাওড়ের গোলাবাড়ি ক্যাম্প লাগোয়া বাঁধে। হাঁটতে হাঁটতে পেয়ে যাই তিন শিশুকে। ওরা ক্ষুদে রাখাল। হাওরে গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে খেলাধুলায় ব্যস্ত। আমরা কি খুঁজছি জানতে চাইলে ওদের বুনো স্ট্রবেরির একটি ছবি দেখাই। ওরা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে। আমাদের সঙ্গে বেশ উৎসাহ নিয়ে খুঁজে বের করে স্ট্রবেরি। সত্যিই তো, চোখের সামনে আমাদের নিজস্ব স্ট্রবেরি! এই স্ট্রবেরি নাকি ওদের দারুণ পছন্দের ফল। বিস্তীর্ণ এলাকায় স্ট্রবেরির ফুল ও ফল ছড়িয়ে আছে। তবে আকারে ছোট হওয়ায় একটু ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে চোখে পড়ে না। এতদিন মনে করেছি গোলাপ এবং স্ট্রবেরির সঙ্গে আমাদের কোনো প্রাকৃতিক সংশ্লিষ্টতা নেই।

বুনো স্ট্রবেরি বাঁকা ধারকযুক্ত, বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী লতানো গাছ। সাধারণত মাটিতে গড়ায়। স্বভাবে অনেকটা থানকুনি গাছের মতো। কাণ্ড অনেক, লম্বা, সরু ও রোমশ। পত্র আঙ্গুলাকারে ৩ থেকে ৫ পত্রক, রোমশ, পত্রক ডিম্বাকার, দ্বি-খাঁজকাটা, শিরা পক্ষল উপরের গা লম্বা সাদা রোমযুক্ত এবং কিনারা সিলিয়াযুক্ত। ফুলের রঙ হলুদ, আড়াআড়ি, দেড় থেকে আড়াই সেমি, লম্বা কাক্ষিক মঞ্জরিদন্ডে একক। পুংকেশর অসংখ্য, ১ সারিতে বিন্যস্ত, পরাগধানী জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত। ফুল ও ফলের মৌসুম ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। এই স্ট্রবেরি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে দেখা যায়। একসময় বৃহত্তর সিলেট ছাড়াও দেশের আরো কয়েকটি স্থানে দেখা যেত। স্থানীয়রা জিহ্বার ক্ষত সারাতে এফল ব্যবহার করেন। বৈজ্ঞানিক নাম *Duchesnea indica*



বুনো স্ট্রবেরি

৩. জলজ ফুল মুয়ামুয়া

রংচী গ্রামে যাওয়ার পথে একটি নলখাগড়ার বন পেরিয়ে ডানে ঘুরতেই অস্পষ্ট কিছু ফুল চোখে পড়ে। মাঝিকে বললাম নৌকা ঘোরাতে। কাছে যাবার পর প্রথমে মনে হলো আমাজন সোর্ড। কিন্তু পাতা তো ভিন্ন। এটি আসলে মুয়ামুয়া বা ছোটকুট *(Sagittaria sagittifolia)*। পাতার গড়ন তীরেরফলার মতো হওয়ায় ইংরেজি নাম Arrowhead। এই দীর্ঘ পথে মাত্র দু'একটি স্থানেই গাছটি দেখা গেছে। মুয়ামুয়া জলা অঞ্চলের বীরুৎ শ্রেণির গাছ। একাধারে ভাসমান বা হাওড়ের কান্দায়ও বেঁচে থাকতে পারে। এটি লম্বাটে ও বাঁকানো ধাবকযুক্ত যার শেষ দিকটা চওড়াভাবে শেষ হয়েছে। পাতা বল্লমাকার বা তীরের মতো, সাড়ে ৩ সেমি এবং ৪ থেকে ৫টি শিরাযুক্ত। পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত, কখনো কখনো নিচের পর্ব ১ থেকে ২টি শাখাযুক্ত হতে পারে। মঞ্জরিদণ্ড ২৫ থেকে ১০০ সেমি উঁচু, মঞ্জরিপত্র উপবৃত্তাকার। পাপড়ি ডিম্বাকৃতির, ১২ থেকে ১৫ সেমি লম্বা। পাপড়ি ১২ থেকে ১৫ মিমি এবং ডিম্বাকৃতির। বীজের রঙ ফ্যাকাশে ধূসর, সহজেই ভাসমান এবং অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফুল ও ফলের মৌসুম জুন থেকে সেপ্টেম্বর।

গাছ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চীনের নববর্ষে এগাছের কন্দমূল খাওয়ার রেওয়াজ আছে। তা ছাড়া জাপান, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডেও সবজি হিসেবে কন্দমূল খাওয়া হয়। গাছের কচিপাতা এবং মোথা কোথাও কোথাও স্যুপ রান্নায়ও কাজে লাগে।



জলজ ফুল মুয়ামুয়া

৪. হাওড়ের লতাফুটকি

হাওরে দুর্লভ বুনো স্ট্রবেরির ফুল ও ফলের পাশেই একটি লতানো গাছে কিছু সুদর্শন ফল চোখে পড়ে। মাটিতে গড়ান লতায় এমন সুদর্শন ফল আগে এখানে দেখিনি। দেখতে ফুটকা বা ফটকার মতোই। কিন্তু ফটকা গাছ বিরুৎ শ্রেণির। আর এটি হলো লতানো। প্রায় একই রকম লতা দেখেছি নিউইয়র্কের ব্রুকলিন বোটানিক গার্ডেনে। ঢাকায় ফিরে উদ্ভিদবিষয়ক বই থেকে গাছটির পরিচয় পাওয়া গেল। স্থানীয়ভাবে ফুটকা, কপালফুটকি, নোয়াফুটকি, কানফুটকি ইত্যাদি নামেও পরিচিত। প্রতিবছর হাওরে পানি শুকিয়ে গেলে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে।

লতাফুটকি *(Cardiospermum halicacabum)* বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী লতা। পত্রবৃন্ত ২ থেকে ৪ সেমি লম্বা ও খাঁজযুক্ত। উপপত্র বল্লমাকার, পত্র ৩-খণ্ডিত এবং পক্ষলভাবে খন্ডিত। মঞ্জরিদণ্ড ৭ থেকে ১০ সেমি লম্বা। মঞ্জরিপত্র বল্লমাকার থেকে উপবৃত্তাকার, ১ থেকে ২ মিমি লম্বা। ফুল ২ থেকে সাড়ে ৩ মিমি লম্বা। বৃত্যংশ ৪টি, লাল দাগবিশিষ্ট সবুজ, বাইরের জোড়া প্রশস্ত, কিনারা সাদা। পাপড়ির শীর্ষ গোলাকার, হুড আকৃতির। পুংকেশর ৮টি, পরাগধানী ০.৫ মিমি লম্বা, উপবৃত্তাকার, হলুদ। ফল ৩-খন্ডিত গোলাকার, দেড় থেকে ৪ সেমি চওড়া, সবুজ, গোড়া লালাভ, রোমশ। বীজ ছোট, কালো ও মসৃণ। ফুল ও ফলের মৌসুম নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। এগাছের মূল এবং বীজতেল বাতের চিকিৎসায় কার্যকর। এছাড়া পাতার রস ডায়াবেটিস ও স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য। গাছের কচি অংশ সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আদিবাসীরা গর্ভপাতের জন্য এগাছের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে।



হাওড়ের লতাফুটকি

৫. জলের ফুল শ্যামাকোলা

শ্যামাকোলা গড়নের দিক থেকে খানিকটা আজব বটে! গভীর জলাশয়েও শুধুমাত্র ফুলটিই পানির উপর দিব্যি ভেসে থাকতে পারে। আবার কখনো কখনো অর্ধনিমজ্জিত পাতাগুলো জড়াজড়ি করে নৌকার মতো ভাসতে থাকে। তবে ফুল সরু নলের মাধ্যমে গাছের গোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। প্রতি বর্ষায় আবার পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিব্যি বেড়ে ওঠে। আসলে এসব গাছের অতি সুক্ষ্ম বীজগুলোর প্রাণশক্তি অফুরান। অনুকুল পরিবেশে বংশবৃদ্ধির জন্য এরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারে। আইইউসিএন প্রকাশিত বায়োডাইভারসিটি অব টাঙ্গুয়ার হাওর গ্রন্থেও এফুলের উল্লেখ রয়েছে। দেশের অগভীর জলাশয়, খাল বিল ডোবা নালা বা বদ্ধপানিতে এগাছ দেখা যায়। তবে তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক বিস্তৃতি অনেকটাই কমেছে।

এরা রাম করোলা, কাক্কোলাই (Ottelia alismoides) বা পানিকোলা নামেও পরিচিত। ইংরেজি নাম ওয়াটার প্লানটেইন, ডাকলেটুস ইত্যাদি। এরা পানিতে নিমজ্জিত বীরুৎ জাতীয় গাছ, মাটিতে মূলীবদ্ধ থাকে। পাতা ভাসমান, স্বচ্ছ, চারপাশ খাড়া, কিনারা দন্তর, গড়নের দিক থেকে প্রশস্ত ডিম্বাকার বা তাম্বুলাকৃতির, সাধারণত ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। উপবৃত্তাকার এই পাতাগুলোর শিরা ৭ থেকে ১১টি, অভিসারী, মূলীয় অংশ ক্রমশ একত্রিত হয়ে একটি বৃন্ত গঠন করে। সবৃন্তক পুং চমসা বহু পুষ্প বিশিষ্ট। বৃত্যংশ ৩টি। পাপড়ি সংখ্যা ৩, সাদা, নিম্নাংশ হলুদ দাগ যুক্ত, দ্বিখন্ডিত পুংকেশর ৬ থেকে ১৫টি। ফল ৩ থেকে ৪ সেমি দীর্ঘ ও শীর্ষ সরু। বীজ অনেক, দীর্ঘায়ত ও পুরু। প্রস্ফুটন মৌসুম প্রায় বর্ষব্যপ্ত।



জলের ফুল শ্যামাকোলা

৬. হাওড়ের রাজসিক হিজল বন

দেশের একমাত্র বৃহৎ ও প্রাচীন হিজল বনটি দেখার জন্য গোলাবাড়ি আনসার ক্যাম্প থেকে রংচীগ্রাম গিয়েছিলাম। শুকনো মৌসুমে হাওড়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিষিদ্ধ। তাই ছোট্ট একটি নৌকায় কোনোমতে যেতে হলো। সঙ্গে শুকনো খাবার, পানি নিলাম। মাথার ওপরে তাঁতানো সূর্য। তবে হাওড়ের ভেজাবাতাস সূর্যের উত্তাপকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। হাতের কাছেই নানান জলজফুল, শ্যাওলা, কারুকার্যময় পানিফলের পাতা ও ফুল, উড়িধান, কাঁটা টকপাতা, নলখাগড়া, চাঁদমালা, চেচরা আরো কত কী! দূরে হঠাৎ দুএকটি জেলে নৌকা দেখতে দেখতেই আবার হারিয়ে যায়। নৈশব্দের সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে তিনটি বিল পেরিয়ে তবেই রংচী গ্রামের প্রান্তে পৌঁছালাম। নৌকা থেকে নেমে প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে পরম কাঙ্ক্ষিত সেই হিজল বনকে স্পর্শ করতে পারলাম। যত দূর চোখ যায় শুধুই হিজল আর হিজল। মনটা ভরে গেল। হিজলের এই সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। কিছু সৌন্দর্য আছে যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন। অথবা কিছু সৌন্দর্য শুধু উপলব্ধি করা যায়, ঠিক এমনই। গাছগুলো ছুঁয়ে দেখি। ছবি তুলি। আবার গাছের ছায়ায় বসি।

বর্ষায় হাওড়ের বিশাল ঢেউ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রংচী গ্রামকে আগলে রেখেছে এই হিজল বন। গ্রামে প্রায় ৪০০ পরিবারের বসবাস। এই বন অন্তত ৭০/৮০ বছরের পুরনো। জানামতে আমাদের দেশে এর চেয়ে পুরনো হিজল বন আর নেই। কিন্তু গ্রামের মানুষ যেভাবে গাছগুলোর ওপর অত্যাচার করছে, তা দেখে মন খুব খারাপ হলো। প্রায় সবকটি গাছেরই ডালছাঁটা, গোড়ায় মাটি নেই, মাটি কেটে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভেতরে আবার ধানচাষও করা হয়েছে। অযত্ন, অত্যাচার ও অবহেলায় ইতোমধ্যেই অনেক গাছ হারিয়ে গেছে। এ ভাবে চলতে থাকলে অচিরেই এ বন ধ্বংস হবে। গ্রামের মানুষদের বোধদয় হওয়া উচিত। এই হিজল বনই তাদের নানাভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে।



হাওড়ের রাজসিক হিজল বন

৭. দুষ্প্রাপ্য মাখনা

প্রাকৃতিক আবাসে মাখনা ফুলের সন্ধান করছি অনেকদিন ধরে। বাইক্কা বিলসহ কয়েকটি জলাশয়ে গাছও দেখেছি। কিন্তু ফুল যেন স্বপ্নই থেকে গেল। অবশেষে হাকালুকি হাওড়ের চাতলার বিলে কয়েকটি ফুল ফোটার খবর পেলাম। খবর পেয়ে রাতেই গাড়িতে চেপে বসলাম। ভোরের আলোআঁধারিতে বাস থেকে নেমে খানিকটা বিরতি নিয়ে হাওড়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। পথে পথে বরুণ আর হুরহুরি ফুলের উৎসব মনোমুগ্ধকর। জুড়ি উপজেলার নয়াগ্রাম হয়ে চাতলার বিলে পৌঁছাতে আরো খানিকটা সময় লাগলো। পেয়ে গেলাম পরম কাঙ্ক্ষিত মাখনা ফুল।

নির্জন এই প্রান্তরের সমস্ত সৌন্দর্য যেন ভিড় করেছে বেগুনি আভার মাখনা ফুলগুলো ঘিরে। কৌলিণ্যের বিচারে হয়তো ওরা উচ্চবংশীয় নয়। কিন্তু আমার কাছে গুরুত্ব ভিন্ন কারণে। যার মধ্যে অন্যতম হলো দুষ্প্রাপ্যতা। এই দুষ্প্রাপ্যতার প্রধান কারণ অতিরিক্ত ফল আহরণ। শুধু বাংলাদেশ বা ভারতেই নয়, মাখনার ফল দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই বেশ জনপ্রিয়। এর প্রধান কারণ ফলটির পুষ্টিগুণ। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, হৃদরোগ, বন্ধ্যাত্ব, প্লীহার সমস্যা, যকৃতের অসুখ, কাশি এবং ডায়বেটিস জনিত অসুস্থতার প্রতিকারে প্রাচ্যের চিকিৎসায় বহুদিন ধরেই মাখনা ব্যবহৃত হচ্ছে।

মিঠা পানির জলাধার, উন্মুক্ত জলাভূমি বা বিলে মাখনা জন্মে। মাখনা কাঁটাযুক্ত জলজ উদ্ভিদ–যার শিকড় ও কন্দ পানির নিচে মাটিতে সন্নিবিষ্ট থাকে, পাতা প্রায় গোলাকার, পানির উপরে ভেসে থাকে। আমাজন লিলির পর মাখনার পাতা উদ্ভিদরাজ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ফুল আকারে শাপলার চেয়ে ছোটো। ভেতরে উজ্জ্বল লাল রং, বাইরের দিকে সবুজ ও উজ্জ্বল বেগুনি রংয়ের। ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির এবং বাইরের অংশ কাঁটাযুক্ত। ফল কচি এবং পরিপক্ব উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। ফলের ভেতরে ছোলার দানার মতো ছোট ছোট বীজ থাকে। সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে সাদা অংশটি খেতে হয়। এটি মিষ্টি স্বাদের। প্রতিটি ফলে সাধারণত ২০টি পর্যন্ত বীজ থাকে। ফুল ফোটে শীতের শেষে।



দুষ্প্রাপ্য মাখনা

৮. দুধিয়া লতা

দুধিয়া লতার পাতার বিন্যাস এবং ফুল অনন্য সৌন্দর্য মণ্ডিত। হাওড়ের কান্দাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে এই ফুল চোখে পড়ে। বুনোফুল বলে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তার আছে স্নিগ্ধশোভা। গাছ লতান, নরম, রোমশ, বহুবর্ষজীবী ও বৃক্ষারোহী। পত্রমোচী, বসন্তে পাতা ঝরায়। পাতার গড়ন লম্বাটে, ৪-৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, বহু শিরাযুক্ত ও বোঁটা অবনত। মঞ্জরিদন্ড একাধিক। ফুলের সাদা জমিনে বেগুনি ও গোলাপি রঙের শিরা স্পষ্ট। তাতেই বৈচিত্র রয়েছে। বর্ষার শেষভাগে ফুল ফোটে, শীতের শুরুতে ফল পাকে। গাছের মূল আঠা ও চূর্ণ ভেষজগুণ সম্পন্ন। মূল জন্ডিস নিরাময়েও ব্যবহার্য। পাতার ক্বাথ মুখের ঘা সারায়। আঠা চর্মরোগে কাজে লাগে।



দুধিয়া লতা

৯. বরুণের স্বর্গরাজ্য হাওর

প্রায় একদশক আগে ঢাকা শহরে আতিপাতি করে খুঁজেও বরুণ গাছের দেখা না পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। অথচ ঢাকার আশপাশের সব জেলায় বরুণ অনেকটাই সহজদৃষ্ট। এমন সহজলভ্য একটি উদ্ভিদ নগর-ঢাকায় নেই! হাওরে যতবার গিয়েছি ততবারই বরুণের পৌষ্পিক ঐশর্য মুগ্ধ করেছে। সেখানে যে তিনটি বৃক্ষ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তার মধ্যে বরুণ অন্যতম। বরুণের ফল নিয়ে ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি আছে। বর্ষায় নৌকাযোগে দূরের আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে যাবার পথে খালপাড়ে পানিতে আধডোবা গাছে কদবেলের মতো ফলগুলো দেখে বারবারই পরিচয় জানতে ইচ্ছে হয়েছে। ছেলেবেলার সেই অচেনা ফলটি চিনতে অনেক বছর পেরিয়ে গেল। দেশের জলাভূমি অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো এই গাছ চৈত্রের শেষ দিকে অজস্র ফুলে ভরে ওঠে। বরুণ প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত।

বরুণ *(Crataeva nurvala)* ১০ থেকে ১৫ মিটার উঁচু, পত্রমোচি গাছ। যৌগপত্র ৩-পত্রিক, মূল বোঁটা ৫ থেকে ১০ সেমি লম্বা, পত্রিকা ৬ থেকে ১৫ সেমি, উপর চকচকে, নিচ ফ্যাকাশে। নতুন পাতার পর বসন্তের শেষভাগে বড় বড় থোকায় সাদা বা বেগুনি আঁচযুক্ত ফুল ফোটে, বোঁটা ৩ থেকে ৫ সেমি লম্বা। পাপড়ি সংখ্যা ৪, মুক্ত, পুংকেশর ২০ থেকে ২৫টি, প্রায় ৪ সেমি লম্বা, বেগুনি। ফল গোল বা ডিম্বাকার, শক্ত, শাঁসাল, ৩ থেকে ৫ সেমি চওড়া। শিকড় থেকে গজান চারা ও বীজে চাষ। গাছটির পরিকল্পিত বীথি বসন্তবাগানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে।



বরুণের স্বর্গরাজ্য হাওর

১০. শতমূলী

শতমূলী আমাদের অতি পরিচিত ওষুধি গাছগুলোর মধ্যে অন্যতম। হাওড়ে পানি শুকিয়ে যাবার পর শতমূলীর গাছগুলো আবার নতুন পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে। গ্রামে একসময় লোকালয় সংলগ্ন বাগানে দেখা যেত।

শতমূলী *(Asparagus recemosus)* বহুমূলা, কেশিকা, শতনেত্রীকা, তেজবল্লী, মধুরা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এরা মূলত বহুবর্ষজীবী লতানো স্বভাবের গাছ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ও ডালপালায় ঝোপাল ধরনের। বাহন পেলে অনেক উঁচুতেও উঠতে পারে। এই গাছের পাতার আকার ও বিন্যাস বেশ নান্দনিক। পাতাগুলো সরু ও ঘনবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। কেউ কেউ পাতার সৌন্দর্যের জন্যও এই গাছ রোপণ করেন। শীত মৌসুমে সব পাতা ঝরে যায়, ফুল ফোটে শরতকালে। আর ফল পাকে মাঘ থেকে ফাল্গুন মাসের মধ্যে। ফল সুগন্ধি এবং আকৃতিতে অনেকটা মটরশুঁটির মতো। বীজ থেকে খুব সহজেই এদের বংশ বৃদ্ধি হয়। সেই আদিকাল থেকেই ভিষকরা এই গাছের বহুমুখী ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। এ কারণে চরক সংহিতা ও প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে গাছটির উল্লেখ আছে। এই গাছের ব্যবহার বহুমুখী। প্রধানত রক্ত দূষিত হলে, রাতকানা রোগ হলে, আমাশয় ও জ্বরে এই গাছ বেশ কার্যকরী। তা ছাড়া কফরোগ, অর্শ, এবং বাতজ্বরেও এই গাছ কাজে লাগে। রক্তমূত্রে শতমূলীর রস ও অন্যান্য উপাদান পরিমাণমতো মিশিয়ে ক্বাথ তৈরি করে খেতে হয়। একইভাবে ফাইলেরিয়ায়ও রস বেশ কার্যকর।



শতমূলী

*লেখক, নিসর্গবিদ ও সাধারণ সম্পাদক (তরুপল্লব)

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: বাংলাদেশের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের একটি কৌশলগত রূপরেখা

অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত*, নওরিন আহসান হাবীব **

বাংলাদেশ বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক *(Global Climate Risk Index)* অনুযায়ী গত দুই দশকে জলবায়ুজনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ বারবার শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় লবণাক্ততা বিস্তার, নদীভাঙন, খরা এবং জীববৈচিত্র্যের দ্রুত হ্রাস দেশের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তার ওপর বহুমাত্রিক চাপ সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, বনভূমি উজাড় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্যকে ক্রমাগত দুর্বল করে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে "২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি" কেবল একটি প্রতীকী বনায়ন উদ্যোগ নয়; বরং এটি বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু সহনশীলতা, প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, সবুজ অর্থনীতি বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের একটি সমন্বিত কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক বাস্তবায়ন এবং সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এই কর্মসূচি বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় একটি ইতিবাচক রূপান্তরের সূচনা করতে পারে।

বন ও বৃক্ষ কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; এগুলো একটি কার্যকর বাস্তুতান্ত্রিক অবকাঠামো। বনভূমি বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখে, মাটিক্ষয় রোধ করে, জলাধার সংরক্ষণ করে এবং অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। নগর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি বায়ুদূষণ হ্রাস, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, শব্দদূষণ প্রশমন এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নগর এলাকায় পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ তাপদ্বীপীয় প্রভাব *(Urban Heat Island Effect)* কমাতে সহায়তা করতে পারে, যা ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা *(FAO)*-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বনভূমি প্রতিবছর প্রায় ২.৬ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ সরকারি হিসেবে মোট ভূমির প্রায় ১৭ শতাংশ হলেও কার্যকর প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ আরও কম। ফলে বৃহৎ পরিসরে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ দেশের পরিবেশগত নিরাপত্তা ও জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল আউয়াল মিন্টু সরকারের পক্ষ থেকে আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ২৫ কোটি গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছেন, যা জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সরকারের ঘোষিত 'ন্যাশনাল গ্রিন মিশন'-এর আওতায় বৃক্ষরোপণ, নদী ও খাল পুনঃখনন, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি চালু এবং ব্লু ইকোনমির সম্প্রসারণ, উপকূলীয় সবুজবেষ্টনী গঠন এবং পরিবেশ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। বিশেষত SDG ১৩ *(Climate Action)*, *SDG* ১৪ *(Life Below Water)*, *SDG* ১৫ *(Life on Land)*, *SDG* ১১ *(Sustainable Cities and Communities)* এবং *SDG* ১ *(No Poverty)*-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বৃক্ষরোপণ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বৃহৎ পরিসরে বন ও সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি কার্বন নিঃসরণ প্রশমন, প্রতিবেশগত সেবা *(ecosystem services)* সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল পুনর্গঠন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর অবদান রাখবে।

একই সঙ্গে সামাজিক বনায়ন, কৃষিবনায়ন এবং ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিকল্প আয়, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সক্ষম। সড়ক, মহাসড়ক ও বাঁধের প্রান্তিক জমিতে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার সরকারি পরিকল্পনা পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে একই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার একটি বাস্তবধর্মী উদাহরণ। এর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততার বিস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, কৃষি ও জীবিকাকে ক্রমাগত হুমকির মুখে ফেলছে।

এই বাস্তবতায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী এবং ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার একটি কার্যকর প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান *(Nature-based Solutions)* হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উপকূলকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বলয় প্রদান করে আসছে। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালের আইলার সময় সুন্দরবনের উপস্থিতি ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছিল বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ এবং মানবসৃষ্ট চাপের কারণে এই প্রতিবেশব্যবস্থাও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন কেওড়া, গেওয়া, সুন্দরী, গোলপাতা, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ করা হলে তা উপকূলীয় ক্ষয়রোধ, জলোচ্ছ্বাসের শক্তি হ্রাস এবং কার্বন সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সরকার কর্তৃক চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা এবং পটুয়াখালী জেলার দ্বীপ ও চরাঞ্চলে নতুন ম্যানগ্রোভ বাগান সৃষ্টির পরিকল্পনা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী জোরদারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ বন মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন ও আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে, যা উপকূলীয় অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, উপকূলীয় বনায়নকে কেবল বন সম্প্রসারণ হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে আবাসস্থল ধ্বংস, দূষণ, অবৈধ দখল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন। বনভূমি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় হাতি, বানর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

যদি পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ বাস্তুসংস্থানগত সংযোগ (ecological connectivity) পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তবে এটি বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও বাস্তুসংস্থানগত সংযোগ পুনঃস্থাপনে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আশপাশে বাফার জোনভিত্তিক বৃক্ষরোপণ মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কমাতেও ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ যদি দেশীয় প্রজাতিনির্ভর এবং প্রতিবেশগতভাবে উপযোগী হয়, তবে তা স্থানীয় জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। একক প্রজাতিনির্ভর বনায়নের পরিবর্তে বহুবিধ দেশীয় প্রজাতি সমন্বিত মিশ্র বনায়ন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অধিক কার্যকর। এর মাধ্যমে পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, পরাগায়নকারী কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য টেকসই আবাসস্থল গড়ে উঠবে। তবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সফলতা কেবল গাছ লাগানোর সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এর দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া বৃহৎ পরিসরের বৃক্ষরোপণ অনেক সময় প্রত্যাশিত পরিবেশগত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়। অতীতে অনেক বনায়ন কর্মসূচি পর্যাপ্ত পরিচর্যা, প্রজাতি নির্বাচন এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অঞ্চলভিত্তিক প্রজাতি নির্বাচন, মৃত্তিকা ও জলবায়ু উপযোগিতা বিশ্লেষণ, সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ কাঠামো নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বন বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত অংশগ্রহণ ছাড়া এই ধরনের বৃহৎ কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু অভিযোজন কৌশলে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানসমূহ ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং অধিক সহনশীল উপকূলীয় অঞ্চল গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্যোগেও একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অতএব, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে কেবল আনুষ্ঠানিক বা প্রতীকী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা না করে, একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিবেশগতভাবে টেকসই জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। নদী ও খাল পুনঃখনন, পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশ শিক্ষা - এসব উদ্যোগকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করা গেলে এর দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তরুণ সমাজ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা গেলে এর সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাংলাদেশের পরিবেশগত পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।

*সদস্য, বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
** শিক্ষার্থী, ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

নদী সুরক্ষায় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও সমন্বয়

এস এম আবু হোরায়রা*, ড. প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দীন হোসেন**

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। ঐতিহাসিকভাবেই পৃথিবীর সকল সভ্যতার মতো বাংলাদেশের সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। নদীতে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন দেশটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়। হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকার সঙ্গে নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষি, শিল্প, বিদ্যুতের উৎস, অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা এবং পানি নিষ্কাশনের উপায়সহ বিভিন্নভাবে এদেশে নদ-নদী ও নদী বন্দরসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অথচ দেশের অধিকাংশ নদী আজ ধ্বংসের মুখে ও মৃতপ্রায়। বিশেষ করে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের নদীগুলো। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। এক সময় মানুষ বুড়িগঙ্গার পাড়ে যেতো সুস্থ বায়ু সেবনের জন্য। এখন আর যায় না, কারণ এখন বুড়িগঙ্গার পাড়ে গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। গত তিন দশক যাবৎ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দুই তীর/পাশ ঘেঁষে ও নদীর মধ্যে অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ একদিকে নদীর জমি বেদখল হয়েছে, নদী ভরাট হয়েছে, নদী সংকুচিত হয়েছে; অন্যদিকে নদীর পানি হয়েছে মারাত্মক দূষিত ও দুর্গন্ধময়। ফলে পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে ও পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসছে।

আবার ঢাকার বাহিরের নদীর তলদেশ থেকে বা নদীর উপর ব্রীজের তলদেশ বা নদী সংলগ্ন বাঁধ/রাস্তা/সরকারি স্থাপনার পাশ থেকে প্রায়শই অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে ব্রীজসহ সরকারি অবকাঠামো, বাড়ি-ঘর, ফসলি জমি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে নদী ভাঙনসহ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও জনদুর্ভোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরও হয় বা হচ্ছে। অথচ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও সর্বোপরি প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-পরিবেশ রক্ষার্থে রয়েছে বিভিন্ন আইন, বিধান, নীতিমালা, আদালতের রায় ও নির্দেশনা, রয়েছে জাতির অঙ্গীকার এবং সরকারের বিভিন্ন অর্গান বা সংস্থা। এত আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতিমালা, জাতির অঙ্গীকার এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন দেশের নদ-নদীর আজ এই অবস্থা হয়েছে! এবং কেন দেশের নদ-নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও দূষণরোধ কাঙ্ক্ষিত বা আশানুরুপভাবে কমানো সম্ভব হচ্ছে না, বরং বেড়েই চলেছে-এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে এ প্রবন্ধটি লেখার প্রয়াস।

নদীর অবৈধ দখল, বালু উত্তোলন, পানি ও পরিবেশ দূষণরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, পরিপত্র ও দর্শন

১) **জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন)**– নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে গঠিত আইন।

২) **অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০**– নিরাপদ ও সুষ্ঠু নৌ চলাচল এবং নদীর স্বাভাবিক গতি, ফ্লো বা প্রবাহ নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ জলপথ ও উহার তীরভূমির উপর স্থাপনা নির্মাণের জন্য গঠিত বিধিমালা।

৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)

৪) নৌ-পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী নৌ-পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি কার্যক্রম (ম্যান্ডেট) হলো- "নৌ অধিক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ রোধ, নদীর ক্ষতিসাধন, অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, অবৈধ দখল ও ভরাট সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ"।

৫) দেশের নদ-নদীর রক্ষার ক্ষেত্রে বহুকাংখিত প্রেক্ষাপট হিসেবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নম্বর ৩৫০৩/২০০৯ এর ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯ তারিখের ঐতিহাসিক রায়ে সুস্পষ্টভাবে নদ-নদী, পানি ও পরিবেশ রক্ষার্থে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব পালন ও বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন।

৬) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক মোতাবেক "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষায়, নদীর পানির গুণগত মান রক্ষায়, জলাভূমি রক্ষায়, জীববৈচিত্র্য রক্ষা সাংবিধানিক অঙ্গীকার।

৭) অবৈধ ও অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন বন্ধে আইন ও আইনের ভিত্তিতে বিধি প্রণয়ন, যেমন ক) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন, ২০২৩ খ) বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫।

৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সময়ের নদী দর্শন ও ঘোষণা-"মানবদেহের রক্তসংবহনতন্ত্র যেমন জীবনকে পরিচালিত করে তেমনি দেশের নদ-নদী, খাল-বিল এদেশের প্রাণস্বরূপ। মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন জালিকা বাঁধাগ্রস্থ হলে যেমন মানবদেহ বিপন্ন হয় তেমনি এদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয়, জলাধার অবৈধ দখল হলে দেশের বিপর্যয় হয়। প্রতিটি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/নাগরিককে এই দর্শন মেনেই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর কিংবা জলাধার, জলাশয় ভরাটকারী ব্যক্তি গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। উন্নয়নের অজুহাতে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাধার কোনক্রমেই দখল করা যাবে না"।

ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের অবস্থা

গত তিন দশক যাবৎ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দুই তীর/পাশ ঘেঁষে ও নদীর মধ্যে অসংখ্য বেআইনি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। দেশের বেশীরভাগ নদ-নদীর তীরভূমি দখল ও নাব্যতা সংকটের চিত্র এবং পানি দূষণ একটি অসহনীয় ও অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা ও আশে-পাশের জেলাগুলোর নদ-নদীর এ চিত্র সহজেই অনুমেয় যা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নম্বর ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে বিবৃত হয়েছে এবং বর্তমানেও সে অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়েছে-সেটা বলা যায় না। প্রতিদিনের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে সেটিই প্রতীয়মান হয়।

মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৩৯৮৯/২০১৬ এর রায়ে আদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম আদেশ নিম্নরুপঃ

"নদী রক্ষা কমিশন-কে তুরাগ নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী দূষণ ও দখলমুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, এবং উন্নয়নের নিমিত্ত আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis) ঘোষণা করা হলো। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায়, অদ্য হতে বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক নৌ চলাচলের উপযোগী করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধিসহ যাবতীয় উন্নয়নে নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে।

নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নদী কমিশনকে সঠিক এবং যথাযথ সাহায্য ও সহযোগীতা দিতে বাধ্য থাকবে"। উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য আপীল বিভাগের সিভিল পিটিশন নং-৩০৩৯/২০১৯ এর রায়ে উপর্যুক্ত ৩ নং আদেশটি বহাল রাখা হয়েছে। তাই বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহকে রক্ষা করতে হবে এবং দেশের নদ-নদী-জলাধারগুলোকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নদীকে বাঁচাতে হবেই!

নদীর সুস্থতার ওপর যেমন মানুষের সুস্থতা নির্ভর করে, তেমনি দেশের সুস্থতাও নির্ভর করে নদীর উপর। নদীকে এ দেশের রক্তনালীও বলা যেতে পারে। আমাদের দেহের শিরা যদি শুকিয়ে যায়, শরীর দিন দিন মৃত্যুর দিকে চলে যায়। তেমনি দেশের নদীগুলো যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে জীবন-জীবিকা, জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কোন কিছুই থাকবে না। তাই নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নদীকে বাঁচাতে না পারলে নদীমাতৃক এ দেশকে বাঁচানো কঠিন হবে। ফলে দেশ হবে বিপন্ন, দেশের মানুষ হবে বিপন্ন, বিপন্ন হবে প্রকৃতি। নিজেদের সুন্দরভাবে বাঁচার জন্যই নদীগুলোকে দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

নদী রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান পরিবেশবান্ধব সরকার গভীরভাবে আন্তরিক। এছাড়া মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা ও সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুসারে নদ-নদী রক্ষায় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জাতীয় ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার রয়েছে। নদ-নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নদী সংবেদনশীলতা, দূরদর্শিতা ও উন্নয়ন পরিচর্যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও এ বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় বিভিন্ন সময়ে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের এ সকল সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অর্থাৎ বিধি-বিধান, আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে বিভিন্ন জেলায় অবৈধভাবে নদী দখল, নদী দূষণ ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় বা হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরাদেশ, পরিপত্র জারী হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ২০১৪ সনের ৫ আগষ্ট হতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কমিশন দেশের সকল নদ-নদী ও জলাভূমির বৈধ অভিভাবক হিসেবে আইনানুগভাবে দখল-দূষণ রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় অবদান রেখে চলছে। নদী ও পানি সম্পদ রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তিনটি কমিটির মাধ্যমে দেশের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার নদী রক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সকল জেলার জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত নদ-নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট নদী, পানি, পরিবেশ নিয়ে একের পর এক মাইলফলক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছেন উচ্চ আদালত। কারণ নদী মাতৃক এই দেশে নদী বেঁচে থাকলে পরিবেশ প্রাণ-প্রকৃতি বেঁচে থাকবে। আগামী প্রজন্ম একটি বাসযোগ্য পৃথিবী পাবে। আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে একটি বাসযোগ্য সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে অবশ্যই নদী রক্ষা আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে হবে। এক্ষেত্রে নদী রক্ষা কমিশন শত বাঁধা উপেক্ষা করে নদী রক্ষা আন্দোলনকে বেগবান করে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নিতে পারে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ভিশন হচ্ছে "দখল ও দূষণমুক্ত স্বাভাবিক প্রবহমাণ নদী" এবং মিশন হচ্ছে "নদীর দখল, দূষণ রোধসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ" এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইনানুগভাবে দেশের সকল নদ-নদী ও জলাভূমির দখল-দূষণ রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সীমিত জনবল ও সীমাবদ্ধ অবকাঠামো দ্বারা কাজগুলো সম্পাদন করা দুরুহ ব্যাপার। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা এবং নদী অবৈধ দখলমুক্ত, নদী তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখা, বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়সহ নদী উন্নয়ন সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা। অর্থাৎ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সরাসরি বাস্তবায়নমূলক কোন কাজ নাই। এজন্য এখন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উচিৎ হবে নৌ পুলিশের মাধ্যমে নদী দখলদার উচ্ছেদ এবং দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যৌথভাবে কাজ করা, নদীকে সুরক্ষা করা এবং নৌ পুলিশকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পরামর্শ দেওয়া এবং আরও সক্রিয়ভাবে দেশের সকল নদ-নদী ও জলাভূমির দখল-দূষণ রোধ ও নাব্যতা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নৌ পুলিশকে উদ্বুদ্ধ করা। অভিভাবক হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকায় থেকে স্থানীয় প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নদী রক্ষা কমিটি, জনপ্রতিনিধি, বাংলাদেশ নদী রক্ষা কমিটি, নদী/পানি সম্পদ প্রকৌশলী বা বিশেষজ্ঞ, সমস্ত ষ্টেকহোল্ডার ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিতভাবে নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নদী দূষণ রোধে নৌ পুলিশকে কার্যকর ভূমিকা রাখার পরামর্শ দিতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় ও প্রতিপালনীয় উদাহরণ

৬০ এর দশকে লন্ডনের টেমস্ নদী কিংবা গ্লাজগোর ক্লাইন নদী কিংবা প্যারিসের সেইন নদী কিংবা রোমের টাইবার নদী কিংবা জাপানের কিওটো শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছোট একটা নদী প্রত্যেকটার অবস্থা বুড়িগঙ্গা নদীর মত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সকল নদীর অবস্থা একেবারেই ভিন্ন । নদী ও পরিবেশ বিষেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত এর ভাষ্যমতে (ফেব্রুয়ারী, ২০২৩), কিওটো শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছোট অগভীর নদীটির বর্তমান অবস্থা এতটাই সুন্দর যে, নদীর উপরে যে সেতু সেখান থেকে দাঁড়িয়ে নদীর তলদেশে যে মাছ আছে সেটাকেও স্পষ্ট দেখা যায়। একদম ঝকঝকে পরিষ্কার নদী। অথচ ৬০ এর দশকে ঐ নদীটাতে ময়লা পড়ে এমন অবস্থা ছিল যে, একটা কুকুর কিংবা বিড়াল ওটার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো-এধরণের ছবি ড. আইনুন নিশাতকে জাপানীরা দেখিয়েছেন।

উপরের ঠিক উল্টো চিত্র বাংলাদেশে ছিলো। ৬০ এর দশকে বুড়িগঙ্গায় শুশুক দেখা গেছে। শতশত জেলে নৌকা দেখা গেছে বুড়িগঙ্গা নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে। যেটা আজ অবাস্তব মনে হতে পারে। ঐসময় বুড়িগঙ্গার পানিতে কাঁচা টাকার কয়েন ফেললে উপর থেকেও পরিষ্কার দেখা যেত, টলটলে পরিষ্কার পানি মানুষ পান করতো। এই পানিতে শহরবাসী গোসল করতো, আনন্দে সাঁতার কাটতো, বর্ষাকালে হতো সাঁতার প্রতিযোগিতা আর সুদৃশ্য নৌকা বাইচ। এক কথায় বুড়িগঙ্গা ছিল আমাদের প্রাণ, জীবনীশক্তি ও আনন্দের সাথী। আর বর্তমানে (প্রায় তিন দশক যাবৎ) ইলিশ মাছ তো দুরের কথা, কোন মাছই বুড়িগঙ্গায় নাই বললে অতিরিক্ত বলা হবে না। বিশেষ করে বর্ষা মওসুম পার হলেই বুড়িগঙ্গার পানি হয়ে যাচ্ছে আলকাতরার মত কালো, বর্জ্যে ঠাসা, দুর্গন্ধময়। এই পানিতে গোসল করলে গায়ে চুলকানি হয়, পান করলে পাতলা পায়খানা, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড,কলেরা এমনকি ক্যান্সারেও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, অসুস্থ-অচল হয়ে পড়ছেন, অনেক মানুষের অকাল মৃত্যুও হচ্ছে। এক কথায়, বুড়িগঙ্গার পানির গুণগতমান নষ্ট হয়েছে বলে পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্যও নষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গবেষণা থেকে এরকমই প্রতীয়মান হয়।

উপরের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বিদেশীরা ৬০ এর দশক থেকে বর্তমানে পানি সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, আর বাংলাদেশে ৬০ এর দশক থেকে বর্তমানে পানি সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে অনেক অবনতি হয়েছে বা ঘটেছে। অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশীরা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে তা হয়নি। তাহলে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কি উন্নয়ন করা সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব বলে মনে করি। আশাবাদী এই কারণে যে, আমরা পরিবেশ বান্ধব সরকার পেয়েছি, পাশাপাশি আমাদের আইন আছে, আদালত আছে এবং জাতির অঙ্গীকার আছে। তাহলে এখন প্রয়োজন হচ্ছে সুপরিকল্পিত সমন্বয়ের মাধ্যমে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। আর এই বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতাসহ প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। অভিভাবক হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সমন্বয়কের ভূমিকায় থাকতে হবে। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে সবই সম্ভব। তাহলে বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ রক্ষা পাবে এবং দেশের নদ-নদী-জলাধারগুলো আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে পাবে। জনগণের দীর্ঘদিনের আশা ও স্বপ্ন পূরণ হবে।

*মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর, **পরিচালক নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু-সহনশীলতা রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের উন্নয়ন অভিযাত্রা

মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান*, ড. সোনিয়া আফসানা**, সুবর্ণা মোশারফ***

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় পরিবেশ কেবল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; এটি জীবন, জীবিকা, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ভিত্তি। একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়, দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিণামদর্শী ব্যবহার এবং নগরায়ণের চাপ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, বিস্তীর্ণ উপকূলীয়, নদীনির্ভর ভূপ্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তুলেছে। একই সঙ্গে দ্রুত শিল্পায়ন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু অভিযোজন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত ১৭টি প্রকল্প, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৬টি প্রকল্প এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় ৫টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের সমন্বিত লক্ষ্য হলো একটি পরিচ্ছন্ন, সহনশীল, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও পরিবেশ শাসন নিশ্চিতকরণ

কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হলো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। এ উপলব্ধি থেকেই পরিবেশ অধিদপ্তর তার অবকাঠামোগত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

"পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে আধুনিক অফিস ভবন, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও কক্সবাজার জেলা কার্যালয় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করবে। এ ধারাবাহিকতায় "বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (BEST)" প্রকল্প পরিবেশ খাতে এক যুগান্তকারী বিনিয়োগ। প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় নির্মাণ, গবেষণাগার সম্প্রসারণ, পরিবেশগত তথ্য ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল রূপান্তর, আধুনিক মনিটরিং ব্যবস্থা, অনলাইন পানি মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ

দূষণ আজ বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্প-কারখানা, যানবাহন, নির্মাণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্ট পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণের ফলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই বাস্তবতায় পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

"শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, এর আওতায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শব্দমাত্রা জরিপ, স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন, বিধিমালা হালনাগাদ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি শব্দ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। একইভাবে "দি প্রজেক্ট ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর এয়ার পলিউশন মনিটরিং" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে অত্যাধুনিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। নতুন রোডসাইড মনিটরিং স্টেশন, উন্নত বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে বায়ুদূষণের উৎস ও মাত্রা সম্পর্কে আরও নির্ভুল তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইং-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ইটভাটাকে স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনছে। অনলাইন ডাটাবেজ, মোবাইল ল্যাব, উন্নত সরঞ্জাম এবং দ্রুততর আইন প্রয়োগ কার্যক্রম পরিবেশগত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিপজ্জনক রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জন

টেকসই উন্নয়নের পথে রাসায়নিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে।

"এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দ্য ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি)/ (Polychlorinated Biphenylene, PCB)" প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে ব্যবহৃত পিসিবি যুক্ত ট্রান্সফর্মার ও ট্রান্সফর্মারের তৈল পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্টকহোম কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা অর্জনে এই প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

"পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প দেশের দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত ডিডিটি মজুদ অপসারণ, ঝুঁকিপূর্ণ কীটনাশক ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ বিকল্প প্রযুক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একই সঙ্গে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। বস্ত্রশিল্পে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের ঝুঁকি কমাতে "রিডিউসিং ইউজেস এন্ড রিলিজ অফ কেমিক্যালস অফ কনসার্ন (CoCs) ইন দি টেক্সটাইলে সেক্টর" প্রকল্প শিল্পখাতে নিরাপদ রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করছে।

ওজোনস্তর সুরক্ষা ও সবুজ প্রযুক্তির প্রসার

বিশ্বব্যাপী ওজোনস্তর সুরক্ষায় মন্ট্রিল প্রটোকল সবচেয়ে সফল পরিবেশ চুক্তিগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত।

"এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্লান (স্টেজ-২)" UNDP কম্পোনেন্ট এবং UNEP কম্পোনেন্ট শীর্ষক দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পখাতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) গ্যাসের ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পসমূহের মূল কার্যক্রম হচ্ছে পরিবেশবান্ধব বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, কাস্টমস সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি।

"ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং ফর দি ফেইজ-আউট অফ ওডিএস (ফেইজ-১০)" প্রকল্পটি পরিবেশ অধিদপ্তরের ওজোন সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং মন্ট্রিয়াল প্রটোকল-এর কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করেছে। এর ফলে ওজোনস্তর সুরক্ষার পাশাপাশি উচ্চ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্ভাবনাসম্পন্ন গ্যাসের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন: সহনশীলতার পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন একটি উচ্চ অগ্রাধিকার। পরিবেশ অধিদপ্তরের একাধিক প্রকল্প এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

"ইকোসিস্টেম বেজড অ্যাডাপটেশন (EbA)" প্রকল্প বরেন্দ্র অঞ্চল ও হাওর এলাকার ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, পানি সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করছে। প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের *(Nature-based Solutions)* এই মডেল ভবিষ্যৎ অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠছে।

"বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় ছোটদ্বীপ এবং নদীর চরের জন্য অভিযোজন উদ্যোগ" শীর্ষক প্রকল্প বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার ঝুঁকি মোকাবিলায় আবাসন, পানি সরবরাহ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা করছে। একই সঙ্গে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও স্থানীয় অবকাঠামো শক্তিশালী করার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

"বিল্ডিংক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশে (বিসিআরএল)" প্রকল্প জলবায়ু সহনশীল কৃষি, মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন, বিনিয়োগ মডেল তৈরি এবং কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

"ইন্টিগ্রেটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপ্টেশন ইনটু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পাথঅয়েজ অফ বাংলাদেশ" প্রকল্প বরেন্দ্রভূমি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকা এবং তিস্তা প্লাবনভূমির মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকৃতিভিত্তিক অভিযোজন ও সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করছে।

জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ হুমকির মুখে রয়েছে। এ বাস্তবতায় পরিবেশ অধিদপ্তর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। "টাঙ্গুয়ার হাওর জলাভূমি প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" জলাভূমি পুনরুদ্ধার, মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি, পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমির দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

"প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এবং জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এলাকায় প্রতিবেশভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রকল্প হালদা নদী ও মরজাত বাওড় এলাকায় ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার, জীবিকা উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।
অন্যদিকে, সেন্টমার্টিন দ্বীপে বাস্তবায়নাধীন অভিযোজন প্রকল্প সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণ, কেয়া বেষ্টনী পুনরুদ্ধার, সৈকত পরিচ্ছন্নতা এবং জলবায়ু সহনশীল বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলা ও অর্থনীতির সুরক্ষা

সমুদ্র ও উপকূলীয় পরিবেশে প্লাস্টিক দূষণ আজ বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়। "ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচ টুওয়ার্ডস সাসটেইনেবল প্রাস্টিকস ইউজ এন্ড মেরিন লিটার প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে নীতিগত সহায়তা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্প শিল্পখাতে Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) প্রযুক্তি এবং Design for Environment (DFE) ধারণার প্রয়োগকে উৎসাহিত করছে, যা টেকসই উৎপাদন ও ভোগব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন-প্রোটোকলের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগ

বাংলাদেশ পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন বাস্তবায়নে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর Biennial Transparency Report Ges National Communication প্রস্তুতকরণ করা হচ্ছে। United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)-এর আওতায় গৃহীত Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)-এর লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। Convention to Combat Desertification (UNCCD)-এর National Report প্রস্তুতকরণ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিবেশ কূটনীতি ও বৈশ্বিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, জনবলের ঘাটতি, অর্থায়ন ও প্রকল্প-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ, পরিবেশগত আইন বাস্তবায়নে অংশীজনদের অপর্যাপ্ত সহযোগিতা এবং জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশগত মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধের দৈন্যসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়াও দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যার আধিক্যর কারণে পরিবেশগত সমস্যা ক্রমেই সংকটপূর্ণ হয়ে উঠছে, যা প্রকল্পগুলোর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে প্রকল্পসমূহের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তথাপি দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান এসব সমস্যাকে অতিক্রম করে প্রকল্পসমূহের যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ কেবল কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি নয়; বরং এগুলো বাংলাদেশের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের একটি সুসংহত রূপকল্প। এসব উদ্যোগে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার বাস্তব পদক্ষেপ রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে সমন্বিত করার দূরদর্শী প্রয়াস।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে বলা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের এই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশসম্মত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি সবুজ, সহনশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে জাতীয় অঙ্গীকার, পরিবেশ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ সেই অভিযাত্রার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

*পরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর), **উপপরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর), ***সহকারী পরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর)

জলবায়ু সংকট, প্লাস্টিক দূষণ ও বায়ুদূষণের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ

প্রফেসর ড. এম. এ. ফারুখ*

বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ৫ জুন নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ ও জনসচেতনতার মাধ্যমে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়; যার মূখ্য উদ্দেশ্য পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত ইতিহাসের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোকেই ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছরই দিবসটি বর্ণিল আকারে সারা পৃথিবীব্যাপি পালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত এবং ২০১০ সালে এই দিবসটি পালনের আয়োজক দেশ ছিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক এবারের পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Climate Action'. এবারের আয়োজক দেশ কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী প্রাচীন ও সম্পদশালী রাষ্ট্র আজারবাইজান। আজারবাইজান কেবল আয়োজক দেশই নয় বরং জলবায়ু অভিযোজন ও সহনশীলতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণও বটে। আজারবাইজান ২০২৪ সালে জলবায়ু সম্মেলন 'কপ ২৯'-এর আয়োজক দেশ ছিল এবং এখন তারা স্থানীয়ভাবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সবুজায়ন তৈরিতে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে তারা আয়োজন করবে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিবেশ মেলা, স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং কার্বন নিঃসরণহীন 'গ্রিন জোন' প্রদর্শনী। এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে পরিযায়ী পাখি এবং সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ; যার মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখা। তাদের এই উদ্যোগ অন্যান্য দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

আমাদের এই পৃথিবী গত কয়েক দশকে ক্রমাগত উষ্ণায়ন, অনিয়মিত বর্ষা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভয়াবহ দাবদাহ, বজ্রপাত ও বন্যার মতো চরম প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করেছে। বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করেছেন যে বর্তমান কার্বন নিঃসরণের হার যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পযুগের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই অবস্থা কেবল পরিবেশের জন্যই নয়, মানবসভ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীববৈচিত্র্যের জন্যও চরম হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে তাপপ্রবাহ এখন আর কোন ঋতুগত অস্বাভাবিকতা বা মৌসুমগত সমস্যা নয় বরং এখন এটি একটি পরিমাপযোগ্য, দ্রুত তীব্রতর, নতুন ও স্বাভাবিক ঘটনায় পরিনত হওয়া একটি সিস্টেমিক পরিবর্তন। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু মানুষের অনুভূত তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা তাপপ্রবাহের প্রকৃত ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, ১৯৯৪ হতে ২০২৪ পর্যন্ত দেশে তাপপ্রবাহের দিনের সংখ্যা প্রায় ১২ গুণ বেড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলো সমুদ্রের প্রভাবে তুলনামূলকভাবে শীতল থাকলেও এখন সেখানে তাপপ্রবাহের উপস্থিতি বাড়ছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রাকৃতিক 'বাফার'গুলো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অংশ, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এবং বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত 'সুন্দরবন' এর বিস্তার ও ঘনত্ব কমেছে দুই-তৃতীয়াংশ। কক্সবাজারে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য, মরছে পশু-পাখি, আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে অনেক বণ্যপ্রাণীর। বন উজাড় করে চাষাবাদের কারণে প্রাকৃতিক পানির উৎসগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, ভরাট হয়ে যাচ্ছে খাল-ঝিরি-ছড়া-ঝর্ণা ইত্যাদি, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হালদার শাখা শুকিয়ে পরিণত হয়েছে গোচরণ ভূমিতে। গবেষণায় দেখা গেছে, কোন শহরে সবুজায়ন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। বড় গাছ বাতাসের ১০-২০ শতাংশ দূষক কণা শোষণ করতে পারে। ঢাকায় প্রতি ২৮ জন মানুষের জন্য মাত্র একটি গাছ রয়েছে যেখানে একজন মানুষের পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জন্য কমপক্ষে ৩টি গাছ প্রয়োজন।

প্লাস্টিক একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান হলেও এর যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপচনশীল প্রকৃতির কারণে এটি এখন একটি বৈশ্বিক দূষণ সংকটে পরিণত হয়েছে। যা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। জেনেভা এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক এর ২০২৫ সালের এক প্রতিবেদনে প্লাস্টিক দূষণের বৈশ্বিক চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতিবছর ৪৩০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হয় যার দুই-তৃতীয়াংশ স্বল্পস্থায়ী পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও দ্রুত বর্জ্যে পরিণত হয়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের হার মাত্র ৯ শতাংশ এবং উৎপাদিত বাকি অংশ ল্যান্ডফিলে জমা হয়, পুড়িয়ে ফলা হয় বা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবছর প্রবাহমান নদীগুলি থেকে প্রায় ৮-১১ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে প্রবেশ করে যার বেশিরভাগই এশিয়া ও আফ্রিকার মাত্র ১০টি নদী থেকে আসে। পৃথিবীজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি মিনিটে সাগরে পতিত হওয়া প্লাস্টিক বোতল ও ব্যাগের সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার ৮০০টি।

প্রতিবছর প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রায় ১৭ মিলিয়ন ব্যারেলের মত তেলের দরকার হয়। শুধুমাত্র ১ কেজি প্লাস্টিক উৎপাদনে ২-৩ কেজি পরিমাণ বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ কোটি টনের বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে যোগ হচ্ছে এবং বিগত ৫০ বছরে সমগ্র পৃথিবীতে জনপ্রতি এক টনের বেশি প্লাস্টিকের দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী মহাসাগরগুলোতে আনুমানিক ৭৫-১৯৯ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পড়ছে যা সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। এসব আবর্জনার একটি বৃহৎ অংশ জমা হচ্ছে হাওয়াই এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যবর্তী প্রায় ১.৬ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত দি গ্রেট প্যাসিফিক গার্বেজ প্যাচে, যা আয়তনে টেক্সাসের প্রায় দ্বিগুণ। প্লাস্টিক সামুদ্রিক আবর্জনার প্রায় ৮০ শতাংশ গঠন করে যা পৃষ্ঠের পনি থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ইকোড্রাইভ কমিউনিটি'র এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ১,০০,০০০ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাস্টিক দূষণের কারণে মারা যায়। এছাড়া প্রায় ৭০০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিক দূষণের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে, ১২৩টি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে ৮১টি প্লাস্টিক খাওয়া বা তাতে জড়িয়ে পড়ার জন্য পরিচিত এবং কচ্ছপ প্রজাতির সবগুলোই এতে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সমুদ্রে বিদ্যমান প্রায় সাতটি সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রজাতির প্রতিটিই জেলিফিশ ভেবে প্লাস্টিককে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে।

সমুদ্রে প্লাস্টিক নির্গমনের এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রে ওজনের দিক থেকে মাছের চেয়ে প্লাস্টিক বেশি থাকবে বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে ১১৪টি জলজ প্রজাতিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে, যার মধ্যে কিছু মানব খাদ্যচেইনেও বিরাজমান রয়েছে। বর্তমানে জীবিত প্রায় ৯০ শতাংশ সামুদ্রিক পাখির পেটে প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে যা তারা সমুদ্রে প্লাস্টিক খাওয়ার কারণে প্রবেশ করছে। হারিয়ে যাওয়া বা ফেলে দেওয়া মাছ ধরার সরঞ্জামের মাধ্যমে মৎস আহরণ শিল্প সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণের প্রায় ১০ শতাংশের জন্য দায়ী। বিশ্বজুড়ে প্রতি মিনিটে এক মিলিয়নেরও বেশি প্লাস্টিক বোতল কেনা হয় যা প্লাস্টিক বর্জ্যের একটি বড় উৎস। উৎপাদিত প্লাস্টিকের প্রায় ৫০ শতাংশ শুধুমাত্র একবার ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নামে পরিচিত এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক উল্লেখযোগ্য বর্জ্য উৎপাদন ও পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। নদী, শহর, গ্রাম এমনকি কৃষিজমিতেও প্লাস্টিক বর্জ্য জমে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। ২০০৫ সালে যেখানে ঢাকায় একজন নাগরিক বার্ষিক গড়ে ৩ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার করতেন, ২০২২ সালে তা বেড়ে ৯ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের মাত্র ৩৬ শতাংশ রিসাইকেল করা হয়, বাকিটুকু পরিবেশে পড়ে থেকে দূষণ সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক বর্জ্য বিশেষ করে একবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিন ও প্যাকেজিং সামগ্রী দেশের প্রধান নদীগুলোতে পড়ে জলজ জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে ফেলছে, ড্রেন ও নর্দমা বন্ধ করে দিয়ে নগরজীবনে ব্যাপক জলাবদ্ধতা তৈরি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নদীর পানি ও মাছের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক বিদ্যমান; যা মানবদেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

আবার, উন্মুক্তভাবে প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় যা শ্বাসকষ্ট, ক্যানসার এবং শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশ ২০০২ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে তবে এটার যথাযথ বাস্তবায়নে দুর্বলতা ও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমানে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধে কঠোর নীতি প্রয়োজন উপরন্তু, প্লাস্টিক কর ও এক্সটেন্ডেড প্রডিওসার রেস্পন্সিবিলিটি চালু করা, রিসাইক্লিং শিল্পে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের ব্যবহার বাড়ানো এবং প্রচারণা চালানো, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সচেতনতামূলক শিক্ষা চালু করা, পাটের মতো পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপকরণের ব্যবহার প্রসার করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বায়ু দূষণ আরও একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এদেশের বাতাসে পিএম ২.৫ এর গড় উপস্থিতি প্রতি ঘনমিটারে ৭৯.৯ মাইক্রোগ্রাম, যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মানের চেয়ে প্রায় ১৬ গুণ বেশি। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ২০২৩ সালে নয়াদিল্লির পরেই ঢাকা দ্বিতীয় দূষিত বায়ুর শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে পিএম ২.৫ এর মাত্রা ছিল ৮০.২ মাইক্রোগ্রাম। ২০২২ সালে বিশ্বে দূষিত বায়ুর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পঞ্চম অবস্থানে ছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, বাতাসে পিএম ২.৫ এর মাত্রা ৫ মাইক্রোগ্রামের অধিক হওয়া উচিত নয় এবং প্রবাহমান বাতাসে এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি সরাসরি ফুসফুস ও রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে থাকে। বিশেষ করে শিশুদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত সর্বশেষ ২০২৪ সালের গ্লোবাল এয়ার কোয়ালিটি নির্দেশিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় গড় দূষণ পরিমাপ করে অনুমান করা হয় যে, দূষণের কারনে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৪.৮ বছর কমে গেছে।

দ্রুত নগরায়ন, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কাজ এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাবে তীব্র শ্বাসযন্ত্রের রোগ বেড়েই চলছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যয়ভার। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে পরিবেশগত কারণে ২ লাখ ৭২ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে, যার মধ্যে বায়ুদূষণ ৫৫ শতাংশের জন্য দায়ী। ঢাকার বায়ুদূষণের ৫৮ শতাংশের উৎস হিসেবে দায়ী করা হয় ইটভাটাকে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়নে ব্যবহৃত ইটের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে কৃষিজমির উপরিস্তরের উর্বর মাটি ব্যবহার আমাদের পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইটভাটার মাটি পোড়ানো ধোঁয়া পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বাড়ছে, বন উজাড় ও ভূমিক্ষয়ের প্রভাবে জীবকূলের নানাবিধ ক্ষতি ও রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজীক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) হতে সংগৃহীত ল্যান্ডস্যাট-৮ ইমেজ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধুমাত্র নারায়নগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের সংযোগস্থলের উপর দিয়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ১৪ কিলোমিটার জায়গায় ২০৮টি ইটের ভাটা রয়েছে। এছাড়া পুরনো ও অপরিচ্ছন্ন যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া বায়ু দূষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নগরায়নের কারণে চলমান নির্মাণকাজ ও রাস্তার ধুলো বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। দেশের সড়কে ফিটনেসবিহীন গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ ৬৮ হাজার নিবন্ধিত যানবাহনের ফিটনেস সনদ ছিল না।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি সাইলেন্ট ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি'র মধ্যে প্রবেশ করেছে। এটি ভবিষ্যতের সমস্যা নয় বরং বর্তমানের বাস্তবতা। জলবায়ু সংকট এখন জনস্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন, কৃষি এবং জ্বালানি নীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি আন্তঃখাতীয় চ্যালেঞ্জ। এটি এখন কেবলমাত্র সরলরৈখিক জলবায়ু প্রতিক্রিয়া নয় বরং দেশের জন্য একটি মৌলিক জলবায়ু রেজিম পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এহেন বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সংকট মোকাবেলায় বেশ কিছু পদক্ষেপ অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী রাখে। বাংলাদেশ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সমুদ্র সম্মেলনে স্বেচ্ছায় সামুদ্রিক দূষণ কমিয়ে আনার অংগীকার করে। জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ১ জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত টানা তিন মাসের জন্য সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশব্যাপী অবৈধ ইটভাটা বন্ধের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' এর আওতায় 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন করেছে। তবে উপরোক্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা ও ভয়াবহতা বিশ্লেষণে একথা সহজেই অনুমেয় যে, পরিবেশগত সংকটগুলো আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অথচ পরিবেশকেই জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার, জীবনীশক্তির ধারক-বাহক এবং ভবিষ্যতের আশ্রয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান নিবিড় এই যোগসূত্র সৃষ্টির শুরু থেকেই বিরাজমান। এই ছন্দের পতন হলে মানুষ, অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবনের বিকাশ হবে বাধাগ্রস্থ এবং জীবের ধ্বংস ও বিনাশ হবে অবশ্যম্ভাবী। খাল পুনঃখনন ও জলাশয় রক্ষা, ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ রোধ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধ করে অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে জলবায়ুগত বিশাল সংকট মোকাবেলায় উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার সমন্বয় করা অতি আবশ্যক। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে আপামর সকলেই এই প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হবে এই কামনা রইল।

*পরিবেশ বিজ্ঞান ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইন্সিটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও মহাবয়ানের ডাক

পাভেল পার্থ*

ইতিহাসবিদ যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ মজুমদার ১৯১০ সালে 'বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ ঢাকার ইতিহাস' লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে 'ঢাকার ইতিহাস' নামে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। উক্ত বইতে ঢাকা অঞ্চলের ভেসলান, বোয়াইলা, সাইতা, সূর্যমণি, বায়েন্দা, খামা, বাওয়া ধানের কথা আছে। করিমগঞ্জী, ভাওয়ালি, বাকরাবাদী ও ভাটিয়াল জাতের পাটের নাম আছে। খাগরি, ধলসুন্দর, মারকুলি, কাজলী, সারঙ্গ, গেন্ডেরি জাতের আখের নাম আছে। হরিণ, চিতা, ভালুক, খেঁকশিয়াল, উদ, সজারু, শশক, কাঠবিড়ালি, বানর, উল্লুক, খাটাশ, কচ্ছপ, কুমীর এবং বহু জাতের সাপসহ নানা বন্যপ্রাণীদের কথা আছে। আছে গৃধিনী শকুন, চিল, কোড়া, বাজ, টিয়া, চন্দনা, ময়না, চড়ুই, বাবুই, বন্যকুক্কুট, হরিকল, ঘুঘু, টুনি, দূর্গাটুনি, ডাহুক, শালিক, দোয়েল, শ্যামা, হরবোলা, ময়ূর, পেঁচা, কুড়াইলা, বক, মাছরাঙা, হাড়গিলা, শামুকভাঙ্গা, বুলবুলি, পিপি, তিতির, খঞ্জন, কাক, দাঁড়কাক, পানিকাউড়, বউ কতা কও, সারস, রামশালিক, ঢুপি, বাদুড়, মদনা, তোতা, ধনঞ্জয়, মানিকজোড়, ভৃঙ্গরাজ, শ্যামা এমন বহুপাখির নাম। শাল, হিজল, শিমূল, পাকুররানী, মান্দার, তিন্তিরী, জারুল, ছাইতান, কাউ, বউনাসহ বহু ভেষজ উদ্ভিদের নাম আছে বইটিতে। মাত্র ১১৫ বছরে কেবল ঢাকা নয়; তৎকালীন সময়ের বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল থেকে নিদারুণভাবে উধাও হয়েছে প্রাণ প্রজাতির এই ঐশ্বর্যময় ভান্ড।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে স্বাধীন দেশে কেমন আছে দেশের প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ? গত পঞ্চাশ বছরে মানুষের সংখ্যা তরতর করে বেড়েছে। কিন্তু নিদারুণভাবে নিখোঁজ হয়েছে বাঘ, শকুন, হাতি, বনরুই কী বটগাছ। গ্রামের পর গ্রাম সবুজ ধানক্ষেত আর পাটের জমিন দুমড়েমুচড়ে তৈরি হয়েছে অপরিকল্পিত নগর। রাসায়নিক ও জীবাশ্বজ্বালানি নির্ভর বাণিজ্যিক কৃষির চাপে আমাদের কৃষিজমি, জলাভূমি ও জনস্বাস্থ্য আজ যন্ত্রণায় কাতর। খাবারে মিশে গেছে বিষ, বিপদজনক সীসা আর ধাতব দূষণ। ক্যান্সারসহ জটিল অসুখ নিত্য বাড়ছে গ্রাম কী শহরে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ, দূষিত পানি, বননিধন, বৃক্ষউজাড়, কালোধোঁয়া, ইটের ভাটা, কৃষিজমি হ্রাস, নদী দখল, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সীসাদূষণ এসব পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে প্রতিদিন।

পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়েছে লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়, উত্তরাঞ্চলে তাপদাহ ও খরা, উত্তর-পূর্বে পাহাড়ি ঢল, মধ্যাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ধ্বস, দেশজুড়ে নদীভাঙন, বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, জলাবদ্ধতা। প্রমাণিত হয়েছে প্রাণ-প্রকৃতির এই জীর্ণ মলিন অবস্থা এবং পরিবেশক্ষয়ের জন্য মূলত মানুষের লাগাতার ভোগবিলাসী উন্নয়ন, মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা এবং নয়াউদারবাদী ক্ষমতা কাঠামো দায়ী। আজ মৌমাছি থেকে শুরু করে হাতি কারোর জীবন সুরক্ষিত নয়। জীবাশ্মজ্বালানি নির্ভরতা আর কার্বন নি:সরণ যেমন পৃথিবীর জলবায়ুপঞ্জিকাকে প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন করছে, একইসাথে অপরিণামদর্শী উন্নয়নের অভিঘাত পরিবেশগত যন্ত্রণাকে আরো জটিল ও দু:সহ করে তুলছে।

প্রাণ-প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু সময়ে দাঁড়িয়ে এখনো বাংলাদেশের মূলশক্তি এর ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। বাংলাদেশ গভীর পানির ধানের আঁতুরঘর, বেগুনের আদি উৎপত্তিস্থল এই দেশ। ২৭ জাতের বাঁশ আছে এখানে। আছে ক্ষুদবেড়েলা, বনহলুদ, জংলিআদা, বিষলতা, কেওখেরা, গিরিশোভন শাক, গুজের কাঁটা কিংবা পাহাড়ি স্বর্ণলতার মতো ২৮ জাতের এনডেমিক উদ্ভিদ; যা কেবল এখানেই জন্মে। ইরাবতী ডলফিন, চামচঠুঁটি বাটান কিংবা বাংলা শকুনের বৃহত্তম বিচরণভূমি এই দেশ। দুনিয়ার বৃহত্তম বাদাবন সুন্দরবন থেকে শুরু করে দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতও এখানে। সাঁওতাল, চাকমা, হাজং, বাঙালি, পাঙাল ও রাখাইনসহ পঞ্চাশোর্ধ জাতিগোষ্ঠী আর চল্লিশোর্ধ্ব মাতৃভাষার সমাহার আছে এই দেশে। ১০০৮ নদী, ১৭ হাইড্রলজিক্যাল এবং ৩০ কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চল, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র কিংবা পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলের ভাটিতে অবস্থান দুনিয়ার খুব কম ভৌগলিক অঞ্চলেই আছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ জোট আইইউসিএন বাংলাদেশের প্রাণবৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৩০ প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ২২ প্রজাতির উভচর, ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণ, ৩২৭ প্রজাতির শামুক ঝিনুক, ৬৬ প্রজাতির কোরাল, অসংখ্য পোকামাকড়, ৫০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ যার ভেতর ১৬০ প্রজাতির শস্য রয়েছে ।

ধান বিজ্ঞানী ড.হেক্টর দেখিয়েছেন একটা সময় এদেশে প্রায় ১৮ হাজারেরও বেশী ধানের চাষ হতো। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী ধানের জাত নামে একটা পুস্তক প্রকাশ করে, যেখানে ১২৪৮৭টি স্থানীয় জাতের ধানের নাম উল্লেখ করা হয়। আরেকটি হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট ২৭৫ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ এবং ৫০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৮৮ প্রজাতির পাখি রয়েছে যার মধ্যে ৫৪ প্রজাতির পাখি আগামী দশ বছরে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে ।

কেবলমাত্র বাংলাদেশ নয়; পৃথিবী জুড়েই আজ প্রাণবৈচিত্র্য কমছে এবং পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় ৬০,০০০ প্রজাতির গাছের ভেতর প্রায় ৩০ ভাগই বিলুপ্তির আশংকায় আছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস ছিল বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে তীব্র দাবদাহের মাস। অসময়ে অতিবর্ষণের ফলে ডুবেছিল দুবাই ও বাংলাদেশের সিলেট-বান্দরবান। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন বৈশ্বিক উষ্ণতার পারদ না থামাতে পারলে পৃথিবীর হিমবাহ গলে যাবে, বহু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত ও জলমগ্ন হবে, বহু প্রাণপ্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে এবং একইসাথে বরফে ঘুমিয়ে থাকা বহু অণুজীব জেগে ওঠবে এবং বিপদজনক মহামারির বিস্তার ঘটাবে।

তাহলে প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ সুরক্ষায় প্রজাতি হিসেবে মানুষের দায়দায়িত্ব কী? পরিবেশ প্রশ্নে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের কেমন হতে পারে? প্রকৃতি ও সংস্কৃতির উপর অন্যায় ভোগদখল ও পণ্যকরণের উপর টিকে থাকা নয়াউদারবাদী ক্ষমতাকাঠামো প্রশ্ন করা আমাদের অন্যতম পরিবেশগত দায়দায়িত্ব। ইরেকটাস, ডেনিসোভান, ফ্লোরিয়েনসিস, নিয়ানডার্থালের পর আমরা এই 'স্যাপিয়েন্স' মানবপ্রজাতিই পৃথিবীর প্রাণপ্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটিয়ে পরিবেশ দূষিত করেছি কেবলমাত্র মানুষের জন্য। 'মানুষ শ্রেষ্ঠ', আর শ্রেষ্ঠতার এই ধারণা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে পরিবেশ হন্তারক এবং দূষণকারী করে তুলেছে। কেবলমাত্র মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গিয়ে আমরা পাখি, সরীসৃপ, তরুলতা, অণুজীব, উভচয় ও লাখো বুনোপ্রাণের সর্বনাশ করেছি। আজ আমরা প্রবলভাবে এই যন্ত্রণা টের পাচ্ছি এবং প্রাণসম্পদের বিলুপ্তি এবং পরিবেশগত সংকট মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, অস্তিত্বকে হুমকীর মুখে ফেলে দিচ্ছে। তাহলে এই গ্রহকে কেবলমাত্র মানুষ নয়, সকলের জন্য বাসযোগ্য করে বিকশিত করতে মানুষ হিসেবে আমাদের পরিবেশ-নৈতিকতা কী হবে?

আমরা কী প্রাণ-প্রকৃতির মহাবয়ানের ডাক শুনবো না? আমরা কী প্রবল 'অ্যনথ্রোপোসেন্ট্রিক (মানুষকেন্দ্রিক) দৃষ্টিভঙ্গি' বাতিল করে সকল প্রাণসত্তার জন্য এই গ্রহের প্রাকৃতিক বিকাশকে চিন্তা করতে পারি? তাহলে এই পরিবেশগত নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের ধারণ করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে এবং অন্যদের ভেতর ছড়িয়ে দিতে হবে। এই গ্রহের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ, তাই প্রাণের বৈচিত্র্য সুরক্ষায় আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে।

প্রাণ, প্রকৃতির চিন্তাদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা যখনি বলি 'নদীটি মারা যাচ্ছে', 'গাছটি হত্যা করা হয়েছে' কিংবা 'ধরিত্রী আমাদের নয়, আমরা ধরিত্রীর' তখন আমরা কোনো না কোনো পরিবেশগত দর্শনকে সামনে হাজির করি। মানুষের জন্য ধান আবাদ করতে গিয়ে বিষ দিয়ে জমির পতঙ্গ-কেঁচো-অণুজীব-বুনো শাক মেরে ফেলা কিংবা দাবদাহের সময় বারান্দায় পাখিদের জন্য পানির পাত্র রাখার ভেতর দিয়ে আমাদের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়।

চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সনে 'প্রকৃতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখবার কায়দাকে' বৈজ্ঞানিক কায়দায় প্রশ্ন করেন। প্রকৃতিতে টিকে থাকবার শর্ত হিসেবে কোনো প্রজাতির ভেতর যোগ্যতম অর্জনকে বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। জন বেল্লামাই ফস্টার 'মার্ক্স ইকোলজি : মেটেরিয়ালিজম এন্ড নেচার' পুস্তকে দুনিয়া কাঁপানো তাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্সের দর্শনপদ্ধতিকে 'প্রতিবেশীয় চিন্তাপদ্ধতি' হিসেবে ব্যাখা করেন। ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত লিওপোল্ডের 'আ স্যান্ড কাউন্টি অ্যালমানাক' পুস্তকের 'দ্য ল্যান্ড এথিক' প্রবন্ধে বাস্তুতন্ত্রের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায়। জারডিন্স তাঁর 'এনভায়রনমেন্টাল এথিকস : অ্যান ইন্ট্রুডাকশান টু এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফি' পুস্তকে উচ্চারণ করেছেন, ...পরিবেশগত সমস্যা ও পরিবেশ-প্রশ্ন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির সমস্যা নয়, মানবিক চেতনা ও নৈতিকতাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

এলসওয়ার্থ হান্টিংটন তাঁর 'সিভিলাইজেশন এন্ড ক্লাইমেট' কিংবা 'প্রিন্সিপালস অব হিউম্যান জিওগ্রাফি' বইতে মানুষের আচরণকে পরিবেশের অধীন হিসেবে ব্যাখা করে পরিবেশকে সংস্কৃতির নিয়ামক বলে মত দেন। পিটার সিঙ্গারের 'অ্যানিমেল রাইটস (১৯৭৬)' ও 'প্র্যাকটিক্যাল এথিকস (১৯৭৯)' পুস্তকসমূহ প্রজাতিবাদকে সমালোচনা করে মানুষ ভিন্ন দুনিয়ার অপরাপর প্রাণিকুলের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। প্রকৃতি ও নারীর উপর লিঙ্গীয় বাহাদুরির বঞ্চনা ও নিপীড়নকে প্রশ্ন করে গড়ে ওঠে প্রতিবেশ-নারীবাদের ধারণা। পরিবেশগত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে আমরা মানবকেন্দ্রিক, প্রাণকেন্দ্রিক, প্রতিবেশকেন্দ্রিক, ডিপ ইকোলজি, শ্যালো ইকোলজি, অমানবকেন্দ্রিক নানা মতবাদ দেখি।

১৯৬২ সালে রাচেল কার্সন তাঁর 'সাইলেন্ট স্প্রিং' বইতে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর কীটনাশকের ভয়াবহ প্রভাবের প্রশ্নকে সামনে আনেন এবং লিওপোল্ড ভূমি-নীতিবিদ্যার মাধ্যমে খাদ্যশৃংখলের সকলে টিকে থাকা ও না থাকাকে সামনে এনেছিলেন। আর এসব বহু তর্কতালাশ আমাদের পরিবেশচিন্তাকে অগ্রসর ও বিকশিত করেছে। আমরা কীভাবে বাঁচবো, কী আমাদের খাওয়া দরকার, কীভাবে চাষ ও উৎপাদন হবে কিংবা প্রাণপ্রকৃতির অন্যান্য প্রজাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কেমন হওয়া দরকার এইরকম নানা প্রশ্ন নানাভাবে বিশ্বজুড়ে ওঠতে থাকে এবং বিকশিত হতে থাকে নানামুখী পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মতৎপরতা।

পরিবেশ-নীতিবিদ্যা ও পরিবেশগত নৈতিকতা

মানুষ ও পরিবেশের ভেতর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে নিয়ে আলাপ করে পরিবেশ-নীতিবিদ্যা(এনভায়রনমেন্ট এথিকস) । অধ্যাপক হোমস রলস্টনকে পরিবেশ-নীতিবিদ্যার জনক বলা হলেও, এর আদিভিত্তি নিয়ে নানা দেশে নানা চিন্তাকাঠামোতো বহু তর্ক, প্রমাণ ও বিশ্লেষণ আছে। রাশিদা আখতার খানম (২০০৯) পরিবেশ-নীতিবিদ্যা নিয়ে তাঁর এক বইতে জানান, মানুষের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে জীবপরিমন্ডলের উপর। মানুষের বুদ্ধিমত্তার উন্নতির সাথে সাথে জীবপরিমন্ডল, পরিবেশ, প্রকৃতি এবং সবৌপরি বাস্তুতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানেরও উন্নতি হয়েছে, এভাবেই মানুষ এখন জানে যে ব্যক্তির মঙ্গল নির্ভর করে বাস্তুতন্ত্রের মঙ্গলের উপর।

পরিবেশগত ক্ষয়ের কারণে সহজলভ্য প্রাকৃতিকসম্পদগুলি ক্রমান্বয়ে দুর্লভ হয়ে ওঠে এবং প্রাণীকূলের বেঁচে থাকাকে সংকটে ফেলে। উচ্চমাত্রায় কৃষিউৎপাদন, খনিজ আহরণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার, দূষণ, কীটনাশকের অপব্যবহার, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে অতিউৎপাদনশীল পুঁজিবাদী অপচয় হলো পরিবেশক্ষয়ের অন্যতম কারণ। পরিবেশগত এই ক্ষয়রোধ করার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের দায় ও দায়িত্ব আছে, দার্শনিক কার্ল মার্ক্স ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য পরিবেশ সুরক্ষার এই দায়কে মানুষের 'নৈতিক দায়' হিসেবে দেখেছেন। তাহলে পরিবেশ সুরক্ষায় এই নৈতিক দায় কী আমরা চলমান সময়ে আমাদের ভেতর ধারণ করতে পারছি? যদি এই পরিবেশগত নৈতিক মূল্যবোধ নিজেদের ভেতর জাগাতে হয় তাহলে আমাদের পাঠপদ্ধতি , অনুশীলন কিংবা তৎপরতা কেমন হওয়া দরকার। পরিবেশ সুরক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ জাগাতে আমাদের প্রথমত 'মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে' খারিজ করতে হবে। বিশিষ্ট পরিবেশনীতিশাস্ত্রবিদ রাধাকমল মুখার্জী এক্ষেত্রে জানান, মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরের জন্য পরিবেশ-নীতিবিদ্যার অনুশীলন জরুরি। পরিবেশ-নীতিবিদ্যার অনুশীলন প্রতিজন মানুষের প্রাত্যহিক যাপিতজীবন থেকেই শুরু করা জরুরি। প্রতিদিন একজন মানুষ ন্যূনতম কতটুকু পানি খরচ করবে কিংবা ন্যূনতম উপকরণ ব্যবহার করে সুস্থভাবে বাঁচার চেষ্টা কিংবা প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ।

পরিবেশ, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রাণপ্রযুক্তি, গবেষণা নিয়ে নানা বৈশ্বিক তর্কে 'প্রাণনীতিবিদ্যা বা বায়োএথিকস' খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ড. বিধান চন্দ্র দাস বায়োএথিকসের বহুবিধ সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে নিজে একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে (২০২৩), '...বায়োএথিকস হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জীবপ্রযুক্তবিদ্যা, প্রাণী তথা জীব কল্যাণ ও অধিকার এবং পরিবেশবিদ্যা উদ্ভূত কিংবা এসব সংক্রান্ত গবেষণার নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়।'

জার্মান দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ পল এম ফ্রিটজ জার জার্মান ভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ইরড়বঃযরশ শব্দটি ব্যবহার করে বিজ্ঞান শিক্ষায় নীতিবিদ্যাকে অর্ন্তভূক্ত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে মার্কিন প্রাণরসানবিদ ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. ভ্যান রেনসিলেয়র পটার 'বায়োএথিকস' শব্দটিকে বহুল পরিচিত করে তুলেন। পরবর্তীতে প্রফেসর ড্যানিয়েল জন ক্যালাহান সত্তর দশকে বায়োএথিকসকে একটি স্বতন্ত্র একাডেমিক বিষয় হিসেবে গড়ে তোলার যুক্ত তুলে ধরেন। ২০০৫ সালের ১৯ অক্টোবর ইউনেস্কোর ৩৩ তম সাধারণসভায় 'প্রাণনীতিবিদ্যা ও মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights)' গৃহীত হয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী ইউনেস্কোর সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহে নিজ দেশের জন্য প্রাণনীতিবিদ্যার ঘোষণা গ্রহণ করার কথা।

বায়োএথিকস বা প্রাণনীতিবিদ্যা এখনো বাংলাদেশে খুব বেশি পাবলিক পরিসরের আলাপ ও অনুশীলনের বিষয় নয়। 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন ২০১০' এর ২.৬ নং অনুচ্ছেদে 'বায়োএথিকস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে, '...যে শাখায় মূল্যবোধ, দর্শন ও জনমতের আলোকে জীববিজ্ঞান, বিশেষত জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাই বায়োএথিকস'। বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল ১৯৭৯ সালে 'জাতীয় এথিকস রিভিউ কমিটি' তৈরি করে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ বায়োএথিকস সমিতি (বিবিএস)' গঠিত হয়। বিবিএস নিয়মিত একাডেমিক জার্নাল প্রকাশ করে।

প্রকৃতির রক্তক্ষত

উত্তর-পূর্বের হিমালয় পাহাড় ও উজান থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদ-নদী ও স্রোতধারায় বয়ে আনা পলিমাটিতে গঠিত হয়েছে এই ব-দ্বীপ। নদীবিধৌত সমতলভূমি, চরাঞ্চল, প্রবালদ্বীপ, বরেন্দ্র, গড়, টিলা, পাহাড়, হাওর, বিল, ঝর্ণা, ঝিরি, ছড়া, গুহা, বাওড়, পত্রঝরা বন, বর্ষারণ্য, ম্যানগ্রোভ বন, গর্জন বন, দ্বীপ সবমিলিয়ে বাস্তুতন্ত্রের এমন বৈচিত্র্য বিরল। কেবল প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নয়, জনজীবনের বৈচিত্র্যও এখানে অনন্য। দেশের এই বৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র আজ দীর্ণ। অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বনউজাড়, জলাভূমি ভরাট, বৃহৎ খনন, রাসায়নিক কৃষি নানাভাবে দেশের প্রাণ-প্রকৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করছে। করোনা মহামারিকালে দুনিয়াব্যাপী এই উপলব্ধি আবার চাঙ্গা হয়েছে যে, প্রাণ-প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ছাড়া এই গ্রহে সকলের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার জীবনবিকাশে স্থানীয় পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র প্রতিনিয়ত যে অবদান রাখছে আমরা এর হিসাব কষে দেখছি না। অথচ পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের এই বিনামূল্যের অক্লান্ত সেবার জন্যই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু অকৃতজ্ঞের মতো মানুষই আবার বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র নিদারুণভাবে বিনাশ করছে। দেশের নদী, মাটি, পাহাড়, অরণ্য, পাখি, বন্যপ্রাণ, জলাভূমি, উদ্যান সবখানেতেই হাহাকার। জবরদস্ত মুনাফামুখী উন্নয়নের ক্ষত। এই ক্ষত মানুষকেই সারাতে হবে। নিজের বাঁচার প্রয়োজনে। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সেবা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ একা কোনোভাবেই বেঁচে থাকতে পারবে না।

রাষ্ট্রীয় বৃহৎ উন্নয়ন অবকাঠামো, বাণিজ্যিক প্রকল্প কিংবা খননের নামে প্রথম কোপ পড়ে প্রাকৃতিক বনভূমি ও গাছের ওপর। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিবিজড়িত ফার্মগেটের শহীদ আনোয়ারা স্মৃতি উদ্যান, ওসমানী উদ্যান, পান্থকুঞ্জ পার্ক, ধানমন্ডি সাত মসজিদ সড়ক কিংবা যশোর রোড ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় বৃক্ষদেরও উন্নয়নের করাতে জীবন দিতে হয়েছে। উপকূল, পাহাড়, সমতল, জলাবন, চর, বরেন্দ্র, শালবন কিংবা গ্রামীণ বনভূমি সর্বত্র গাছেরা আজ অনিরাপদ। তাহলে দেশের ২৫ ভাগ বনভূমি ও সবুজবলয় আমরা কীভাবে অর্জন করবো? প্রতিদিন তপ্ত ও দূষিত হয়ে ওঠা দেশে কীভাবে বসবাস করবো? জলবায়ু সংকটের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের টিকে থাকবার জন্য পর্যাপ্ত গাছ ও সবুজবলয় দরকার। কেন উন্নয়নের নামে বারবার এই গাছ কেটে দেশকে ও দেশবাসীর জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে?

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদীরা আজ দখল ও দূষণে আক্রান্ত। নদীভরাট, শিল্প ও রাসায়নিক দূষণ, নদীদখল এবং উজানে বাঁধ ও বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণ ক্রমশ সব নদীর প্রবাহকে বিনষ্ট করছে। নদীনির্ভর অর্থনীতি আজ ঝুঁকির মুখে। নদীর মতো দেশের পাহাড় গুলো আজ ভাল নেই। নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে চট্টগ্রাম ও সিলেটে পাহাড়ধ্বসের ঘটনা বাড়ছে। ছড়া-পাহাড় ও ঝিরি থেকে বালু ও পাথর উত্তোলনের নামে দেশের সীমান্তবর্তী বাস্তুতন্ত্রগুলো আজ ছিন্নভিন্ন। জীবাশ্ম জ্বালানি অনুসন্ধান ও খনন প্রক্রিয়া দেশের বনভূমি এবং প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলকে বিপন্ন করছে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন নিজের জীবন দিয়ে দেশকে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস থেকে বাঁচালেও আমরা এই বনের প্রতি দায়িত্বশীল নই। রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, শিল্পকারখানা দূষণ কিংবা প্লাস্টিক দূষণে আজ এই বন আক্রান্ত।

রেমা-কালেঙ্গা, রাজকান্দি, লাউয়াছড়া, মধুপুর শালবন, ভাওয়াল শালবন, আলতাদীঘি, পাথারিয়া বনগুলি প্রশ্নহীন অগ্নিকান্ডে বারবার পুড়েছে। উপকূলীয় গর্জনবন, উপকূল চরের ম্যানগ্রোভ বন আজ দখল এবং বৃক্ষশূণ্য হয়ে পড়ছে। ইকোপার্ক প্রকল্প, বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণ, সড়কপথ, বাণিজ্যিক প্রকল্প, বাণিজ্যিক পর্যটন কিংবা নগরায়ণের নামে প্রাকৃতিক বনভূমির সর্বনাশ ঘটছে। দেশে প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কৃষিজমি কমছে। কৃষিজমি কমার পাশাপাশি গোপাট, চারণভূমি এবং গ্রামাঞ্চলে উন্মুক্ত প্রান্তর হ্রাস পেয়েছে। লাগাতার ইটভাটা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পকারখানার দূষণে মাটি-বাতাস ও পানি আক্রান্ত হচ্ছে। লাগাতার ঢাকা বিশ্বের সবচে দূষিত বায়ুর নগর হয়ে ওঠেছে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, ঢাকার নিমতলীসহ বহুবার দেশে রাসায়নিক বিস্ফোরণ এবং বিপজ্জনক অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিপজ্জনক রাসায়নিকের ব্যবহার থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনের সকলস্তর এখনো রাসায়নিকমুক্ত না হওয়ায় আমাদের খাদ্য এখনো নিরাপদ হয়ে ওঠেনি। যার ফলে মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার স্বাস্থ্যহানি ও জটিল কঠিন রোগবালাই বাড়ছে। দেশে এখনো সুষ্ঠু পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। বিপদজনক বর্জ্যস্তুপ নানা রোগবালাই এবং দূষণ ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ লাখ ৯৫ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। কঠিন বর্জ্যের দশভাগই প্লাস্টিক।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর মাধ্যমে প্রায় ৭৩ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য বঙ্গোপসাগরে মেশে। প্লাস্টিক দূষণের পাশাপাশি ডিজিটাল বর্জ্য আজ দেশের জন্য আরেক অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কিছুটা সবুজবলয় এখনো সুরক্ষিত থাকলেও শহরে সবুজবলয়, পার্ক, উন্মুক্তপ্রান্তর, খেলার মাঠ ও জলাভূমি সবই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী মানুষ, নারীসহ সকল বয়স ও শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য পরিবেশবান্ধব নগর গড়ে ওঠেনি এখনো।

মহাবয়ানের ডাক

আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভেতর দিয়েই বদলে যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ। দেশের দুটি রামসার অঞ্চল সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন আজ বিপন্ন। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড়ে উপুর্যপুরি কর্পোরেট কয়লা, পাথর ও ইউরেনিয়াম খনির ফলে টাঙ্গুয়ার হাওর ক্রমান্বয়ে এক প্রত্নতাত্ত্বিক জলাভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্পসহ সুন্দরবনের চারধারে গড়ে ওঠেছে শিল্পাঞ্চল। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে বহুজাতিক খননে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। রাতারগুল কী চিম্বুক পাহাড় বিপন্ন পর্যটনের চাপে। মধুপুর জাতীয় উদ্যান আগ্রাসি বাগান কী ইকোপার্কের আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু অংশ নিয়ে টিকে আছে। উজানে বাঁধ আর ভাটিতে দখল ও দূষণের মাধ্যমে দেশের সব নদী আজ মরণ যন্ত্রণায় অস্থির।

প্রতিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও বৈচিত্র্য সুরক্ষার কোনো কার্যকর রাজনৈতিক দায় ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয়নি রাষ্ট্রে। পরিবেশ কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ আজ নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার বাণিজ্যিক পণ্য। কিন্তু তারপরও গ্রাম থেকে শহর এখনো বহু মানুষ পরিবেশ রক্ষায় জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছেন। গ্রাম ও শহরের প্রবিবেশগত সমস্যা কী বাস্তুতন্ত্রের সংকট এক নয়। গ্রামীণ পরিসরের বাইরে শহরের বৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র আরো বেশি ক্ষতবিক্ষত এবং নিশ্চিহ্ন। নগরে এখন পাবলিক উদ্যান, হাঁটার পথ, খেলার মাঠ, জলাশয় কী উন্মুক্ত স্থান দিনে দিনে কমছে। শহরের চারধারে জমা হচ্ছে বিপজ্জনক বর্জ্যের স্তুপ।

আজ আমাদের প্রিয় গ্রহ এক নিদারুণ পরিবেশ ও জলবায়ুগত সংকটের খাদে দাঁড়িয়ে। এই সংকট আমরাই তৈরি করেছি। তাই নিজের দেশ ও প্রিয় গ্রহকে বাঁচাতে মানুষ হিসেবে আমাদেরকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। প্রাণ-প্রকৃতির স্বাস্থ্য ও খাদ্যশৃংখলের সুরক্ষায় আমাদের বিনিয়োগ দরকার। পাহাড়ের জন্য, অরণ্যের জন্য, নদীর জন্য, হাওরের জন্য, ঝিরি-ছড়ার জন্য, বাওড়-বিলের জন্য, বরেন্দ্র কী গড়ের জন্য, সমুদ্র বা দ্বীপের অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক বিকাশের জন্য বিনিয়োগ দরকার। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দখল-দূষনের বাহাদুরি থামানো এবং সর্বক্ষেত্রে পরিবেশগত নৈতিক মূল্যবোধ ও পরিবেশ-জিজ্ঞাসাকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষার সকল স্তরে পরিবেশ-নীতিবিদ্যা এবং পরিবেশগত নৈতিকতার পাঠ ও অনুশীলন সক্রিয় করতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষায় নৈতিকতার নানামুখী চর্চা জারি রাখা জরুরি। একইসাথে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিবেশ-নৈতিকতার শিক্ষা ও বার্তাকে প্রচার প্রসারে ভূমিকা রাখতে পারে।

বৃক্ষ-পরিবেশ-প্রকৃতি সুরক্ষায় সংবিধান, বৈশ্বিক সনদ ও দেশের আইন-নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন'। জাতিসংঘের আন্তজার্তিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ ১৯৯২, রামসার ঘোষণা, সাইটেস সনদ, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কিংবা ২০২১ সনে গ্লাসগো সম্মেলনে গৃহীত বিশ্বের বৃক্ষ ও বন সুরক্ষা নীতি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ পরিবেশ ও বৃক্ষ সুরক্ষায় বৈশ্বিক অঙ্গীকার করেছে। একইসাথে ২০৩০ সালের ভেতর জাতিসংঘের ১৭টি স্থায়িত্বশীল লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কেবল প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র, গৃহপালিত বা বুনোপ্রাণ নয়; চিড়িয়াখানার বন্যপ্রাণীদের বন্দী করে আমরা বিনোদন করতে পারি কীনা এই তর্কও ওঠেছে বিশ্বময়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং শীতকালে চিড়িয়াখানার বন্দী প্রাণীদের শীর্ণ, অসুস্থ, মুমূর্ষু ছবি আমরা প্রতিবছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখি। এমনকি আমাদের সাফারিপার্কেও নিদারুণভাবে বহু বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে। চিড়িয়াখানার নৈতিক বৈধতা এবং চিড়িয়াখানার প্রাণীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সুরক্ষায় ২০০৩ সালের নভেম্বরে কোস্টারিকায় গৃহীত হয়েছে 'কোড অব এথিকস অ্যান্ড অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশনস অব জুওস অ্যান্ড অ্যাকোরিয়াম'। বাংলাদেশের কোনো চিড়িয়াখানাই এই নীতিমালা গ্রহণ করেনি। ১৯২০ সালের 'দ্য ক্রুয়েলিটি টু অ্যানিমেল অ্যাক্ট' রহিত করে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ 'প্রাণী কল্যাণ আইন' তৈরি করে। উক্ত আইন অনুযায়ী কোনো প্রাণী কষ্ট দেয়া যাবে না, বিনোদনের জন্য প্রদর্শন করা যাবে না, পরিবহনের সময় অল্প জায়গায় দমবন্ধ অবস্থায় রাখা যাবে না।

কিন্তু আমরা আমাদের প্রাণীদের সাথে কি ধরণের আচরণ করি ভাবা যায়? ঈদুল আজহার আগে দেশজুড়ে উল্লিখিত আইনকে লংঘন করে নির্মমভাবে প্রাণীদের পরিবহন করা হয় কিংবা প্রতিদিন কী নিদারুণভাবে বাজারের দোকানে হাঁস-মুরগি বিক্রি হয়। এখনো হাতিদের দিয়ে নির্মম পরিশ্রম করানো হয়। বন্যপ্রাণীদের বিনোদন কিংবা চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়। আমরা কী প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, নীতি ও অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল থাকবো না? প্রাণ, প্রকৃতি ও প্রতিবেশের যে মহাবয়ান বিরাজিত আছে আমরা কী এই বয়ানের অংশ হবো না? দার্শনিক কার্ল মার্ক্স আমাদের জানান, ...মানুষ প্রকৃতির জন্যই বেঁচে থাকে, প্রকৃতির সাথে সার্বক্ষনিক কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া জরুরি।

আজকের নতুন প্রজন্ম কী প্রকৃতির সাথে কথপোকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে? রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রের'

৬৪ তথা ছিন্নপত্রাবলির ৭০ সংখ্যক পত্রে বিশ্বকবি যেভাবে নিজের সাথে গাছের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন তা নতুন প্রজন্মকে টের পেতে হবে। কারণ রাষ্ট্র বা এজেন্সি এই উপলব্ধির জন্য নিজের কলিজা বা মনোযোগ কোনোটাই প্রস্তুত করতে পারেনি। ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ...এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এই ধরিত্রী ক্রমাগতভাবে আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, প্রজাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকা আজ প্রবল প্রশ্নের মুখোমুখি।

সোনাগঙ্গা নামে একটি পাখির কথা ১৯১০ সালে 'বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ ঢাকার ইতিহাস' বইতে উল্লেখ করে লেখকদ্বয় লিখেছেন, সেই পাখিটি তখন ঢাকায় খুব একটা দেখা যায়নি। তারা উল্লেখ করেন, ১৮৬৮ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ৪২ ইঞ্চি লম্বা একটি সোনাগঙ্গা পাখি দেখেছিলেন। সোনাগঙ্গা বা সোনাজঙ্গা দেশের এক হারিয়ে যাওয়া বড় পাখি। অনেকে রাঙ্গা মানিকজোড় বা রঙ্গিলা বকও বলেন। মাত্র একশ বছরে বিলুপ্ত হওয়া এই পাখিরা এখন জলাভূমিতেও বিরল। মহাবয়ানের ডাক শোনার প্রস্তুতি না নিলে আমরা নিজেরাই একসময় প্রত্নতাত্ত্বিক জীবাশ্মে পরিণত হবো। পরিবেশ-নৈতিকতার চর্চা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ জাগানোর ভেতর দিয়ে এই মহাবয়ানের ডাক শোনার প্রস্তুতি তৈরি হোক জনে জনে, গ্রাম-শহরে, পাহাড়-সমতলে, বিশ্বনিখিলে। পরিবেশগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার ভেতর দিয়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সুরক্ষিত থাকবে এবং বিকশিত হবে ধরিত্রীর প্রতি আমাদের নাগরিক দায়দায়িত্ব।

১ বিস্তারিত দেখুন: রায়, যতীন্দ্রমোহন এবং মজুমদার, কেদারনাথ। ১৯১০, বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণ ঢাকার ইতিহাস (প্রথম খন্ড), বই দুটি ১৯১০ সালে ভারত থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর ২০২২ সালে বাংলাদেশের আকাশ নামের সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস সংস্থার এক প্রকাশনা থেকে কমল চৌধুরীর সম্পাদনায় পুন:প্রকাশিত হয়, ঢাকা, পৃ. ৯১-১১১

২ IUCN. Position of Bangladesh vis-a-vis Convention on Biological Diversity, source : http://www.sdnbd.org/biodiv_iucn.htm

৩ উল্লাহ, মাহফুজ; চৌধুরী, জুনাইদ কবীর; সিদ্দিকী, ড. রেজোয়ান এবং জোহরা, ফাতেমা। জীববৈচিত্র্য : সহায়ক নির্দেশিকা (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট, ঢাকা, পৃ. ৬৩-৬৫

৪ দেখুন: Randhir, T.O and Erol, A. 2013, Emerging threats to forests: resilience and strategies at system scale, American Jornal of Plant Sciences 4: 739-748

৫ দেখুন: খানম, রাশিদা আখতার, ২০০৯, পরিবেশ নীতিবিদ্যা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.১১৭

৬ দেখুন: Garvey, Gerald, 1972, Energy, Ecology, Economy, W. W. Norton and Company Inc, New York.

৭ দেখুন: Mukherjee, Radhakamal, 1942, Mobility, Ecological and Social, in: Social Forces, 21 (2): 154-159

৮ দেখুন: দাস, বিধান চন্দ্র, ২০২৩, বায়োএথিকস : তত্ত্ব, ইতিহাস এবং প্রয়োগ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২৩-২৪

৯ দেখুন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

১০ দেখুন: Marx, Karl, 1974, Early writings, New York, Vintage, P. 328, 359-60

*প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য বিষয়ক গবেষক ও লেখক। পরিচালক, বারসিক

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে অশুভ আত্মা

হাসান জাহিদ*

আজ থেকে অর্ধশতকেরও বেশি আগে বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু পরিস্থিতি যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জাতিসংঘের মানব-পরিবেশ সম্মেলন। তখন স্লোগান ছিলো- Our Only Earth. সেই স্লোগান বা থিম আবার ফিরে আসে ২০২২ সালে। অর্থ, গত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ে পৃথিবীর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি; বরং অবনতি হয়েছে।

সমুদ্রস্ফীতি ও নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে এবং হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে জলবায়ু উদ্বাস্তু তৈরির নাজুক অবস্থা। বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে আখ্যা লাভ করেছে 'পোস্টার চাইল্ড' হিসেবে। এতোদিন ধারণা করা হচ্ছিলো যে, ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও ভঙ্গুর ভৌগোলিক অবস্থানের দেশগুলোই চরম বিপন্ন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানেডার উপকুলীয় অঞ্চল চরম বিপন্নতার শিকার হতে যাচ্ছে।

এই পর্যন্ত বহু কনফারেন্স অব পার্টিজ বা কপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলাফল–ডিবেট এবং কেউ কাউকে ছাড় না দেয়ার প্রতিযোগিতা। শেষে ফান্ড সৃষ্টিতে একমত হওয়া। যে ফান্ড সৃষ্টি হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, জোর তদ্বিরের মাধ্যমে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সংগ্রহ করে সেই অর্থে বাংলাদেশের অজস্র ক্ষতগুলো কি সারবে! নিজস্ব অর্থায়নে, খাপ খাইয়ে নিয়ে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশকে। আর কোনো বিকল্প নেই। অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা ও খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রাপ্ত ফান্ড-এর সর্বোচ্চ সঠিক প্রয়োগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের দক্ষ নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অগ্রযাত্রায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হবে এবং সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া হবে–এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘনঘন ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস ও জলবায়ু উদ্বাস্তু সংকট আগামী দিনে বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে।

প্রধান ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

১. উপকূলীয় অঞ্চল

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, ভোলা প্রভৃতি জেলা সবচেয়ে ঝুঁকিতে
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি: কৃষিজমি অনুপযোগী হয়ে পড়ছে, ফলে খাদ্য উৎপাদন কমছে
- জলবায়ু উদ্বাস্তু: অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে স্থানচ্যুত হচ্ছে

২. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

- মৌসুমি বৃষ্টির ধরণ বদলে গেছে: কখনো অতিরিক্ত, কখনো একেবারেই অনুপস্থিত
- ধান, গম, পাট, আলুসহ প্রধান ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে
- খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে, দারিদ্র ও অপুষ্টি বাড়তে পারে

৩. স্বাস্থ্যঝুঁকি

- তাপদাহ ও পানির সংকট: হিটস্ট্রোক, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে
- শহরাঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে শিশু ও বয়স্করা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

- ঘূর্ণিঝড়ের ফ্রিকোয়েন্সি ও তীব্রতা বেড়েছে: সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), আম্পান (২০২০) ভয়াবহ ক্ষতি করেছে
- দুর্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও কৃষি ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- অভিযোজন ব্যবস্থা: সাইক্লোন শেল্টার ও বাঁধ নির্মাণ, ভাসমান চাষাবাদ বর্ধিতকরণ
- আন্তর্জাতিক সহায়তা: উন্নত দেশগুলোর প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন
- জনসচেতনতা ও শিক্ষা: তরুণদের মধ্যে জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ঘনবসতি ও নদীনির্ভর জীবনধারা একে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত করেছে। আগামী দিনে টেকসই কৃষি, দুর্যোগ মোকাবেলা অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংকট মোকাবেলা করা কঠিন হবে।

জলবায়ু উদ্বাস্তু

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার ফলে লাখো মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে শহর ও অন্য অঞ্চলে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এ সংকট শুধু মানবিক নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও বড় হুমকি।

জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যার মূল কারণ

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: উপকূলীয় জেলা যেমন খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালীতে জমি ডুবে যাচ্ছে
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি: কৃষিজমি অনুপযোগী হয়ে পড়ছে, ফলে জীবিকা হারাচ্ছে মানুষ
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), আম্পান (২০২০) এর মতো দুর্যোগে হাজারো পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে
- বন্যা ও নদীভাঙন: উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে নদীভাঙন ও বন্যায় গ্রাম হারিয়ে যাচ্ছে

বর্তমান পরিস্থিতি

- সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ৫ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে
- স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকগুলো আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে
- শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

- শহরমুখী অভিবাসন: গ্রাম থেকে ঢাকাসহ বড় শহরে মানুষের ঢল নামছে, ফলে নগরায়নে বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়েছে
- অর্থনৈতিক ক্ষতি: কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন ধ্বংস হয়ে জীবিকা সংকট তৈরি করছে
- সামাজিক অস্থিরতা: জমি ও কাজের অভাবে দারিদ্র, বেকারত্ব ও সংঘাত বাড়ছে

করণীয়

- অভিযোজন কৌশল: ভাসমান কৃষি, লবণ সহনশীল ফসল, সাইক্লোন শেল্টার প্রভৃতির উন্নয়ন ও নির্মাণ
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু তহবিল থেকে সহায়তা বাড়াতে বিশ্ব দরবারে তদ্বির করতে হবে। আর সেই অর্থ যেন যথাযথ ক্ষেত্রে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্টন ও ফলোৎপাদক হয়
- পুনর্বাসন পরিকল্পনা: দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নিরাপদ আবাসন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা জরুরি
- শিক্ষা ও সচেতনতা: জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পদ্ধতি চালু করা

বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা কেবল পরিবেশগত নয়, বরং মানবিক সংকট। আগামী দশকে লাখো মানুষ তাদের বাস্তুভূমি হারাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। টেকসই পুনর্বাসন, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং স্থানীয় অভিযোজন ছাড়া এই সংকট মোকাবেলা সম্ভব নয়।

ঢাকা শহরে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আগমন

জনসংখ্যার চাপ: বস্তি বিস্তার, কর্মসংস্থানের সংকট ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার শিকার হয়ে ও জমি হারিয়ে রাজধানিতে আশ্রয় নিচ্ছে, ফলে নগর ব্যবস্থাপনায় বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ঢাকায় আগমন

- উপকূলীয় জেলা যেমন খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালী থেকে মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার কারণে জমি হারিয়ে ঢাকায় চলে আসছে
- এরা সাধারণত কর্মসংস্থানের খুঁজে বস্তি এলাকায় বসতি স্থাপন করে, যেমন মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কুর্মিটোলা ও কামরাঙ্গীরচর
- ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,২০০ মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হিসেবে প্রবেশ করছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জনসংখ্যা ও আবাসন

- ঢাকার জনসংখ্যা ইতোমধ্যেই ২ কোটিরও বেশি। এই সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের কারণে বস্তি ও অননুমোদিত বসতি দ্রুত বাড়ছে।
- অপরিকল্পিত নগরায়ন: জমির সংকটের কারণে আবাসন সমস্যা তীব্র হচ্ছে। ফলে অপিরিকল্পিতভাবে আবাসন গড়ে উঠছে। নদী দখল হচ্ছে। খালবিল ও জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠছে আবাসন, কলকারখানা ও ইটের ভাটা

কর্মসংস্থান

- উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিক, ফলে তারা নিম্নআয়ের কাজ যেমন রিকশা চালানো, গার্মেন্টস শ্রমিক রুপে বা গৃহকর্মে যুক্ত হয়
- শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ায় স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়াসহ নানা রোগের প্রকোপ বাড়ছে
- বস্তি এলাকায় পরিষ্কার পানি ও স্বাস্থ্যসেবায় তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও অবকাঠামোতে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে
- অপরাধ, মাদকসেবন ও অবৈধ মাদক কারবার এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন: বস্তি এলাকায় মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করা
- স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ: সাশ্রয়ী চিকিৎসা ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ
- গ্রামীণ এলাকায় অভিযোজন প্রকল্প: উপকূলে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, ভাসমান কৃষি ও বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি
- বৃক্ষরোপণ: সারাদেশে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে

সংক্ষেপে, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ঢাকায় আগমন শুধু মানবিক সংকট নয়, বরং নগর ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আশা করতে দোষ নেই। কার্বন কমাতে হয়তো এগিয়ে আসবে অনিচ্ছুক পরাশক্তিধর দেশগুলো। সেটাই হবে প্রকৃত সমাধান। প্রথমত কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে বিশ্বজুড়ে। দ্বিতীয়ত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে সহজ উপায়ে ও বিনা শর্তে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অভ্যন্তরীণ দূষণ ও নিঃসরণ কমাতে হবে নিজস্ব অর্থায়নে ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে।

*পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, (সার্টিফায়েড মেম্বার, ইকো-ক্যানেডা, ক্যালগেরি, আলবার্তা), কথাশিল্পী ও সংগীতশিল্পী

টেকসই রাষ্ট্র গঠনে পরিবেশ রক্ষার সমন্বিত মহাপরিকল্পনা এখন সময়ের দাবি

অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার*

বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, পরিবেশ এবং জলবায়ু বাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। গত এক দশকে দেশের অর্থনীতি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডিজিটাল সংযোগ এবং নগরায়ণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, বিদ্যুৎ ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কিন্তু একইসঙ্গে পরিবেশগত চাপও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, নদীদূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, তাপপ্রবাহ, জলাবদ্ধতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব এখন দেশের উন্নয়ন যাত্রার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায় পরিবেশ আর কেবল প্রকৃতি সংরক্ষণের বিষয় নয়; এটি এখন জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগর ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি জাতীয় অগ্রাধিকার। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতেই হবে। কারণ প্রকৃতি ধ্বংস করে কোনো উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই নগরায়ণ দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করলেও অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ পরিবেশের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। রাজধানী ঢাকা আজ বিশ্বের অন্যতম দূষিত মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক Economist Intelligence Unit (EIU)-এর ২০২৫ সালের "Global Liveability Index"-এ ১৭৩টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ছিল ১৭১তম। বসবাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে এই নিম্ন অবস্থানের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বায়ুদূষণ, যানজট, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং নগর ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা IQAir-এর ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের গড় $PM_{2.5}$ মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নিরাপদ সীমার তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ বেশি। বিশ্বের দূষিত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ঢাকার বায়ুমান সূচক (AQI) প্রায়ই ৩০০ অতিক্রম করে "Hazardous" পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই দূষণের প্রভাব এখন দেশের জনস্বাস্থ্যে মারাত্মকভাবে দৃশ্যমান। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Energy Policy Institute (EPIC)-এর Air Quality Life Index 2024 অনুযায়ী, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৫.৫ বছর পর্যন্ত কমে যাচ্ছে। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং শিশুদের নিউমোনিয়ার হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে বায়ুদূষণের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, পুরোনো যানবাহনের কালো ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধূলিকণা, খোলা স্থানে বর্জ্য পোড়ানো এবং শিল্পকারখানার নির্গমন। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে আন্তঃসীমান্ত দূষণের প্রভাবও বাংলাদেশের বায়ুমানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ভারতের ইন্দো-গ্যাঙ্গেটিক সমভূমি থেকে দূষিত বায়ু বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়, যার ফলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তবে একইসঙ্গে স্থানীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণও অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। Continuous Air Monitoring Station (CAMS) সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শহরে রিয়েল-টাইম বায়ুমান পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ইট প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারে উৎসাহ এবং নগর সবুজায়ন কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

একইসঙ্গে বর্তমান সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার আওতায় প্রায় ২৫ কোটি গাছের চারা রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, সামাজিক বনায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বৃক্ষরোপণ এবং নগর সবুজায়ন কার্যক্রম জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কার্যকর প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করছে।

বায়ুদূষণের পাশাপাশি শব্দদূষণ এখন বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এক নীরব জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (CAPS)-এর গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার প্রায় ৮২ শতাংশ এলাকায় শব্দের মাত্রা WHO নির্ধারিত নিরাপদ সীমা অতিক্রম করেছে। রাজধানীর অনেক এলাকায় শব্দের মাত্রা 90–110 ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে নিরাপদ সীমা ৫৫ ডেসিবেলের নিচে হওয়া উচিত।

যানবাহনের অতিরিক্ত হর্ন, নির্মাণকাজ, লাউডস্পিকার এবং উচ্চশব্দে অনুষ্ঠান নাগরিক জীবনে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে দেশের প্রায় ১১.৭ শতাংশ মানুষের শ্রবণশক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনিদ্রা, মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। বাংলাদেশের নদীগুলোও বর্তমানে মারাত্মক পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু, কর্ণফুলীসহ বহু নদী শিল্পবর্জ্য, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অপরিশোধিত পয়োবর্জ্যে দূষিত হয়ে পড়েছে। নদী দখল এবং অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

রাজধানীর আশপাশের নদীগুলোর অনেক স্থানে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা এত কমে গেছে যে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড এবং চর্মরোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী দূষণ শুধু পরিবেশগত সংকট নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনীতির সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত। মৎস্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় জেলেদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাল ও নদী ভরাটের কারণে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ড্রেনেজ ব্যবস্থায় প্লাস্টিক ও বর্জ্য জমে যাওয়া অন্যতম কারণ। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ ট্রাকভর্তি প্লাস্টিক নদী ও সাগরে প্রবেশ করছে, যার একটি অংশ বাংলাদেশের জলাশয়গুলোতেও জমা হচ্ছে।

এই সংকট মোকাবিলায় বর্তমান সরকার নদী পুনরুদ্ধার, খাল খনন এবং জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী খনন, খাল পুনঃখনন, জলাধার সংরক্ষণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ঢাকার চারপাশের খাল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, চট্টগ্রাম ও খুলনার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প এবং উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ড্রেজিং কার্যক্রম পরিবেশ ও নগর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা, নৌ-যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বন্যা ব্যবস্থাপনায় এসব উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বব্যাংকের "What a Waste 2.0" রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন ২৫ হাজার টনের বেশি কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ৭,৫০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার বড় অংশ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় না। এই বর্জ্য ল্যান্ডফিলে জমা হয়ে মিথেন গ্যাস নির্গমন, দুর্গন্ধ, জলদূষণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

তবে বর্জ্য এখন কেবল সমস্যা নয়; এটি সম্ভাবনার উৎসও হতে পারে। বর্তমানে সরকার ও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করছে। ঢাকার আমিনবাজারে একটি বৃহৎ Waste-to-Energy প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার টন বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইভাবে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরেও বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশের জৈব বর্জ্যের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বায়োগ্যাস উৎপাদন এবং সার্কুলার অর্থনীতি গড়ে তোলার সুযোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় দীর্ঘমেয়াদি হুমকিগুলোর একটি। বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান ০.৫ শতাংশেরও কম হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮৫টির বেশি চরম আবহাওয়া-সংক্রান্ত দুর্যোগের সম্মুখিন হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, খরা ও তাপপ্রবাহ এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা।

২০২৪ সালের তীব্র তাপপ্রবাহ দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি করেছে বলে আন্তর্জাতিক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমঘণ্টা কমে যাওয়া, কৃষি উৎপাদন হ্রাস এবং বিদ্যুৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক চাপ আরও বেড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইতোমধ্যে লক্ষাধিক হেক্টর কৃষিজমিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। বিভিন্ন গবেষণায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি প্লাবিত হতে পারে এবং প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ জলবায়ুজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু অভিযোজন ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে একাধিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত বদ্বীপ পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য নিরাপদ, জলবায়ু সহনশীল এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। পানি ব্যবস্থাপনা, নদী রক্ষা, কৃষি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজনকে এই পরিকল্পনায় সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতেও বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০,০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের উল্লেখযোগ্য অংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বায়ুশক্তির সম্ভাবনাও যাচাই করা হচ্ছে। সোলার হোম সিস্টেম ইতোমধ্যে দেশের লাখো পরিবারকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে।

বাংলাদেশের পরিবেশগত নিরাপত্তার সঙ্গে সুন্দরবনের অস্তিত্ব গভীরভাবে জড়িত। UNESCO ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন কেবল জীববৈচিত্র্যের আধার নয়; এটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বলয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সুন্দরবনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দূষণ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অবৈধ কার্যক্রমের কারণে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র ক্রমাগত চাপের মুখে পড়ছে। তাই ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার, বন সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরও সমন্বিত পদক্ষেপ জরুরি।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করবে না; এটি নির্ভর করবে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও জলবায়ু সহনশীলতার ওপর। নদী, বন, কৃষিজমি, জলাভূমি এবং বায়ুমণ্ডল যদি নিরাপদ না থাকে, তবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতাও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই এখন সময় এসেছে একটি সমন্বিত জাতীয় পরিবেশ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের–যেখানে উন্নয়ন, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, নগর পরিকল্পনা এবং জলবায়ু অভিযোজনকে একইসঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশের সামনে এখনও বড় সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, সবুজ, সহনশীল ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবেশ রক্ষা এখন কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; এটি জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করতে হবে। কারণ একটি সুস্থ পরিবেশই পারে একটি সমৃদ্ধ, নিরাপদ এবং টেকসই বাংলাদেশের ভিত্তি নির্মাণ করতে।

*ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ; যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং চেয়ারম্যান, বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যায়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)।

জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় সমাধান ও অভিযোজনক্ষমতাঃ বাংলাদেশ ও কক্সবাজারের বাস্তবতা

খন্দকার মাহমুদ পাশা*, আফরোজা ইসলাম শশী**

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যখন মানুষকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের জীবনযাপন, উন্নয়ন-দর্শন এবং প্রকৃতির প্রতি আচরণ নতুন করে পর্যালোচনা করতে হয়। বর্তমান সময়টি ঠিক তেমনই এক সন্ধিক্ষণ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতির সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করেছে, যেন পৃথিবীর সম্পদ সীমাহীন । অথচ প্রকৃতির নিজস্ব সহনশীলতারও একটি সীমা রয়েছে। সেই সীমা অতিক্রমের ফলাফল আজ দৃশ্যমান। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, দূষণ, বন উজাড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই বাস্তবতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আর কেবল নৈতিক আহ্বান নয়; এটি টিকে থাকার পূর্বশর্ত। প্রতি বছর পালিত বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দিবস এই বার্তাকে আরও জোরালো করে তোলে। ২০২৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত নয়; বরং সহাবস্থানই টেকসই ভবিষ্যতের একমাত্র পথ।

জলবায়ু সংকট বলতে দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়াগত পরিবর্তন এবং তার ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে বোঝায়। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে কয়লা, তেল ও গ্যাসের ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বেড়েছে। Intergovernmental Panel on Climate Change-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মানবসৃষ্ট কার্যক্রমই বর্তমান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। এর ফলস্বরূপ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, হিমবাহ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ ও দাবানলের মতো দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, সুপেয় পানির সংকট তীব্র হচ্ছে এবং রোগবালাইয়ের বিস্তারও বাড়ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এই সংকটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে উন্নয়নশীল ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ওপর, যদিও ঐতিহাসিকভাবে দূষণের জন্য তারা তুলনামূলকভাবে কম দায়ী। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি বদ্বীপ অঞ্চল। অসংখ্য নদ-নদী, দীর্ঘ উপকূলরেখা, উচ্চ জনঘনত্ব এবং দুর্যোগপ্রবণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ দেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এখন নিত্য বাস্তবতা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমি, সুপেয় পানি এবং জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে নদীভাঙনের কারণে প্রতিবছর বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, যা জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যাকে আরও প্রকট করছে।

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় প্রথম পদক্ষেপ হলো এর কারণ কমিয়ে আনা, যা mitigation নামে পরিচিত। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে । একই সঙ্গে বন উজাড় বন্ধ করে বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা জরুরি, কারণ বনভূমি পৃথিবীর প্রাকৃতিক কার্বন শোষক হিসেবে কাজ করে। শিল্পকারখানা, যানবাহন এবং ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত প্রধান আইন হলো বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ যা ২০১০ সালে সংশোধিত হয়েছে। এই আইনের আওতায় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, পরিবেশগত মানদণ্ড নির্ধারণ এবং দূষণকারী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনার আগে অবস্থানগত ছাড়পত্র (Site Clearance) গ্রহণ বাধ্যতামূলক। দূষণকারী তরলবর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্জ্য শোধনাগার (Effluent Treatment Plant-ETP) স্থাপন এবং নির্ধারিত মান বজায় রাখা আবশ্যক। আইন অমান্য করলে ক্ষতিপূরণ, জরিমানা, কারাদণ্ড বা প্রতিষ্ঠানের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিধান রয়েছে।

এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণিতে বিভক্ত করে ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পকারখানার জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment-EIA) বাধ্যতামূলক। যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (পরবর্তীতে সড়ক পরিবহন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত) এবং সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর অধীনে যানবাহনের ফিটনেস, ধোঁয়া নির্গমন এবং ইঞ্জিনের মান নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে।

অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান পরিচালনা করতে পারে। সিএনজি, বৈদ্যুতিক যানবাহন ও উন্নত জ্বালানি প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ এর বিধান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনে কৃষিজমি, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার নিকটে ইটভাটা স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রচলিত দূষণকারী চিমনিভিত্তিক ভাটার পরিবর্তে জিগজ্যাগ, হাইব্রিড হফম্যান বা টানেল কিলন প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং বায়ুদূষণ কমায়।

এছাড়া বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ এবং শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫-ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। আইন কার্যকরে পরিবেশ অধিদপ্তর, ভ্রাম্যমাণ আদালত, নিয়মিত মনিটরিং, নির্গমন পরিমাপ প্রযুক্তি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। টেকসই নগর পরিকল্পনা, সবুজ এলাকা বৃদ্ধি, উন্নত গণপরিবহন, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শক্তি-সাশ্রয়ী অবকাঠামো গড়ে তোলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি এবং পানি-সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি চালু করতে হবে।

তবে শুধু সংকটের কারণ কমানোই যথেষ্ট নয়, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। তাই অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। স্থিতিস্থাপকতা বলতে বোঝায় দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা, ক্ষয়ক্ষতির পর দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা-সহনশীল আবাসন ব্যবস্থা, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জলবায়ু-সহনশীল ফসলের উন্নয়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রস্তুতি এসব উদ্যোগ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির বাস্তব উদাহরণ।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন নীতি ও আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ নীতি, ২০১৮ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জলবায়ু অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়া পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ পরিবেশগত অপরাধ বিচারের জন্য একটি বিশেষ বিচারিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।

কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় জেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সামনের সারির একটি অঞ্চল। পর্যটন, জীববৈচিত্র্য, বন, পাহাড়, উপকূলীয় Ecological Critical Area (ECA) ও সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতি এ জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজারে তিনটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পাহাড়ধস, পাহাড় ধ্বংস, উপকূল ক্ষয়, প্লাস্টিক দূষণ, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় ইসিএ বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লেখিত বিধিনিষেধ অমান্য এবং বন উজাড়ের কারণে কক্সবাজার বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ঝুঁকি মোকাবিলায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, উপকূলীয় বনায়ন, পাহাড়ধস প্রতিরোধ এবং পর্যটন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত,হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং ইনানী সমুদ্র সৈকত এলাকায় সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ু সংকট মোকাবিলা কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়; নাগরিকদেরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়, পানি সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন, বৃক্ষরোপণ, গণপরিবহন ব্যবহার, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন ব্যক্তিগত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে । বিশেষ করে উপকূলীয় ও পর্যটন এলাকায় দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয় পরিশেষে বলা যায়, ২০২৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করায় যে, পৃথিবী রক্ষার সংগ্রাম আসলে নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার সংগ্রাম। উন্নয়ন ও পরিবেশকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে দেখতে হবে। জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আইন, নীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে একই সূত্রে গাঁথতে হবে। আমরা যদি এখনই সচেতন হই এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তবে এখনও একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য ও টেকসই পৃথিবী নির্মাণ সম্ভব। পরিবেশ রক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। তাই ২০২৬ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের চেতনায় আমাদের অঙ্গীকার হোক প্রকৃতিকে রক্ষা করব, ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করব।

*উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; **সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর।

প্লাস্টিক মোকাবিলায় বহুমাত্রিক পদক্ষেপ

ফাহিম আহম্মেদ মন্ডল*

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু আবিষ্কার আছে, যেগুলো মানুষের জীবনকে একইসঙ্গে সহজ করেছে এবং বিপদের মুখেও ঠেলে দিয়েছে। প্লাস্টিক তার অন্যতম বড় উদাহরণ। একসময় এটি ছিল আধুনিকতার প্রতীক; আজ সেটিই পরিবেশ, স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং নগর ব্যবস্থাপনার জন্য বৈশ্বিক সংকটের নাম। ১৯০৭ সালে বেলজিয়ান রসায়নবিদ বেকেল্যান্ড প্রথম সিনথেটিক প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছিলেন। তখন হয়তো তিনিও কল্পনা করেননি, এক শতাব্দীর মধ্যেই এই আবিষ্কার পৃথিবীর প্রতিটি সমুদ্র, নদী, বন, পর্বতশৃঙ্গ, কৃষিজমি, এমনকি মানবদেহের রক্ত ও প্ল্যাসেন্টা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

গবেষণা বলছে, বর্তমানে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি'র তথ্য অনুযায়ী, এর প্রায় অর্ধেকই একবার ব্যবহারযোগ্য বা সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক; ব্যবহারের কয়েক মিনিট পরই যেগুলো বর্জ্যে পরিণত হয়, কিন্তু পরিবেশে থেকে যায় শত-শত বছর। প্রতি বছর প্রায় ১৯ থেকে ২৩ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য জলজ পরিবেশে ঢুকে পড়ছে। প্রতিদিন সমুদ্র, নদী ও জলাধারে আনুমানিক ২,০০০টি ট্রাক পরিমাণ প্লাস্টিক ফেলা হচ্ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রে মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের পরিমাণ বেশি হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং দ্রুত নগরায়ণ, ভোগবাদী সংস্কৃতি, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সস্তা প্লাস্টিকের সহজলভ্যতার কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। আমাদের শহরগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে ৩,০০০ টনই প্লাস্টিকভিত্তিক। ঢাকা শহরেই প্রতিদিন হাজার হাজার টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার বড় একটি অংশ প্লাস্টিক। রাজধানীতে গত দু দশকে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে; ২০০৫ সালে যেখানে জনপ্রতি গড় ব্যবহার ছিল ৩ কেজি, ২০১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৯ কেজিতে।

প্লাস্টিকের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো এর অপচনশীলতা। সাধারণ পলিথিন ব্যাগ মাটিতে মিশতে শত-শত বছর সময় নেয়। সূর্যালোক ও তাপের প্রভাবে এগুলো ভেঙে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, যাকে বলা হয় মাইক্রোপ্লাস্টিক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সতর্ক করে বলছে, প্লাস্টিক থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, বিশেষ করে বিসফেনল-এ (বিপিএ), থ্যালেটস ও ডাইঅক্সিন- হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। এর ফলে বন্ধ্যাত্ব, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, লিভার ও কিডনির জটিলতা পর্যন্ত তৈরি হতে পারে। আমরা প্রতিদিন গরম খাবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে বহন করছি, চা-কফি খাচ্ছি প্লাস্টিকের কাপে, বাজারের পণ্য নিচ্ছি পাতলা পলিথিনে; অথচ বুঝতেই পারছি না ধীরে ধীরে কতটা বিষ নিজেদের শরীরে জমা করছি।

এই সংকটের আরেকটি ভয়াবহ মাত্রা হচ্ছে সামুদ্রিক ও স্থলজ প্রাণীর ওপর প্রভাব। প্রতিবছর লক্ষাধিক সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিক খেয়ে কিংবা প্লাস্টিকের জালে আটকে মারা যায়। সমুদ্রের কচ্ছপ জেলিফিশ ভেবে পলিথিন খেয়ে ফেলে; পাখিরা খাবার মনে করে প্লাস্টিক কণা গিলে ফেলে। বাংলাদেশের নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলেও মাছের পেটে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এই বিষ আবার মানুষের শরীরেই ফিরে আসছে।

তবে সমস্যাটি যত গভীর, সমাধানের পথও তত বহুমাত্রিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইতোমধ্যে প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় নানা কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাগুলো বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

রুয়ান্ডা ২০০৮ সালে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করে। বিমানবন্দরে যাত্রীদের লাগেজও তল্লাশি করা হয় যেন কেউ প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। ফলস্বরূপ, রাজধানী কিগালি এখন আফ্রিকার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন নগরগুলোর একটি। কেনিয়াও ২০১৭ সালে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করে অবৈধ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান চালু করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২১ সাল থেকে সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে স্ট্র, প্লেট ও কটন বাডসহ বিভিন্ন পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। জার্মানি ও সুইডেনের মতো দেশগুলো 'সার্কুলার ইকোনমি' মডেলের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে।

জাপানও বর্জ্য পৃথকীকরণে অত্যন্ত কঠোর। নাগরিকদের ঘর থেকেই প্লাস্টিক, কাগজ, কাচ, জৈব বর্জ্য আলাদা করতে হয়। ফলে পুনর্ব্যবহার সহজতর হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় 'ভলিউম-বেইজড ওয়েস্ট ফি' চালুর মাধ্যমে বেশি বর্জ্য উৎপাদনের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে উৎসাহ দিচ্ছে।

নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ক নগর পরিকল্পনায় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যেখানে হাঁটাচলা, সাইকেল ব্যবহার ও স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে অতিরিক্ত প্যাকেজিং ও ডেলিভারি নির্ভরতা কমে। অন্যদিকে সান ফ্রান্সিসকো 'জিরো ওয়েস্ট সিটি' ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার ও কম্পোস্টিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে।

ভারতও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে কাপড়ের ব্যাগ ও জৈব-বিয়োজ্য প্যাকেজিং ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকায় এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক শহরে 'স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সেন্সরযুক্ত ডাস্টবিন বর্জ্যের পরিমাণ বুঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিটি করপোরেশনকে তথ্য পাঠায়; নির্দিষ্ট রুটে বর্জ্য পরিবহন করা হয়; পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আলাদা করা হয় প্রযুক্তিগত উপায়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে পুরো প্রযুক্তি একসঙ্গে বাস্তবায়ন কঠিন হলেও ধাপে ধাপে শুরু করা সম্ভব।

বাংলাদেশের জন্য এসব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্লাস্টিক সংকট কেবল পরিবেশের নয়; এটি নগর পরিকল্পনা, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন ভাবনারও সংকট। ঢাকার জলাবদ্ধতায়ও প্লাস্টিক বর্জ্যের ভূমিকা স্পষ্ট। খাল, নালা ও ড্রেন পলিথিনে আটকে সামান্য বৃষ্টিতেই নগরজীবন অচল হয়ে পড়ে। গবেষণা বলছে, ঢাকার ৬৫টি প্রাকৃতিক নালার মধ্যে মাত্র ১৫টি মূল নালা সঠিকভাবে খনন ও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলে শহরের সিংহভাগ জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। এই উদ্যোগগুলোকে বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি।

প্লাস্টিক সংকট মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিকল্প ব্যবস্থা। কারণ প্লাস্টিক সস্তা, হালকা এবং সহজলভ্য। তাই বিকল্পকেও হতে হবে ব্যবহারবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা পাটশিল্প। একসময় 'সোনালি আঁশ' হিসেবে পরিচিত পাট পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের সেলুলোজ থেকে বায়োডিগ্রেডেবল 'সোনালি ব্যাগ' উদ্ভাবন করেছেন, যা মাটিতে সহজেই মিশে যায়। গবেষণা দেখাচ্ছে, ১ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করলে এটি প্রায় ১৫ টন পর্যন্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতে পারে। বাড়ন্তকালে পাট পরিবেশে প্রায় (১০০ দিন) ১১ টন পর্যন্ত অক্সিজেন ছাড়ে। সঠিক নীতি ও বিনিয়োগ থাকলে এই খাত শুধু প্লাস্টিকের বিকল্প নয়, বরং রপ্তানি আয়ের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে।

একইভাবে কলাপাতা, বাঁশ, আখের ছোবড়া, ধানের তুষ, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় ইতোমধ্যে সামুদ্রিক শৈবাল দিয়ে বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং তৈরি করা হচ্ছে। ভারতের কিছু অঞ্চলে আরেক ধাপ এগিয়ে ধানের খড় ও কৃষিজ বর্জ্য থেকে খাদ্য প্যাকেজিং উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এই ধরনের উদ্যোগের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

তবে শুধু প্রযুক্তি বা সরকারি নীতি দিয়ে এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রা অতিরিক্ত ভোগবাদী হয়ে উঠছে। অনলাইন শপিং, ফাস্ট ফুড সংস্কৃতি, হোম ডেলিভারি, সবকিছুই প্লাস্টিক নির্ভর। একটি ছোট পণ্য কিনতেও একাধিক স্তরের প্যাকেজিং ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আমরা চাইলে পরিবর্তন করতে পারি। বাজারে কাপড় বা পাটের ব্যাগ সঙ্গে নেওয়া, একবার ব্যবহারযোগ্য বোতলের বদলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতল ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় স্ট্র, প্লাস্টিক কাপ এড়িয়ে চলা; এসব ছোট অভ্যাসও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 'এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি (ইপিআর)' নীতিকে প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলার কার্যকর উপায় হিসেবে গ্রহণ করছে। এই নীতির আওতায় যে প্রতিষ্ঠান প্লাস্টিক পণ্য বাজারজাত করবে, ব্যবহারের পর সেই বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের দায়ও তাদেরই বহন করতে হবে। ইউরোপের অনেক দেশে এটি বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশেও প্রক্রিয়াধীন ইপিআর গাইডলাইন বাস্তবায়িত হলে বড় বড় পানীয় ও প্যাকেজিং কোম্পানিগুলো পরিবেশগত দায়বদ্ধতার আওতায় আসবে।

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নতুন করে ভাবতে হবে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা আরও কার্যকর করতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই পুনর্ব্যবহার, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পরিবেশবান্ধব অভ্যাস শেখানো জরুরি। কারণ আচরণগত পরিবর্তন ছাড়া কোনো আইনই দীর্ঘমেয়াদে সফল হয় না।

একই সঙ্গে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও এই আন্দোলনের অংশ হতে হবে। পৃথিবীর বহু দেশে চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি, শিল্পকর্ম ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্লাস্টিকবিরোধী সচেতনতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশেও তরুণ সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় কমিউনিটিগুলোকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্লাস্টিক দূষণ কেবল পরিবেশের সংকট নয়; এটি উন্নয়ন মডেলের সংকট। আমরা কেমন নগর চাই, কেমন অর্থনীতি চাই, কেমন জীবনযাত্রা চাই, এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে প্লাস্টিক সমস্যাটি সরাসরি জড়িত। উন্নয়ন যদি নদী, মাটি, বায়ু ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে, তবে সেই উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মানবসভ্যতার জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, নদী দূষণ, নগর সংকট ও জনস্বাস্থ্যের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এই বাস্তবতায় প্লাস্টিক দূষণ প্রাণঘাতী; প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি নীতি, কঠোর বাস্তবায়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং নাগরিক সচেতনতা। কারণ প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় না; কেবল প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ভয়াবহতা আমরা ইতোমধ্যেই জলাবদ্ধতা, দূষণ ও জীববৈচিত্র্য-ক্ষয়ের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। সময় এসেছে প্লাস্টিক নির্ভর ভোগবাদী সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে টেকসই-পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের পথে হাঁটার।

আশার বিষয়, পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের আইনি প্রচেষ্টার ইতিহাস দীর্ঘ। ২০০২ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ অনন্য নজির স্থাপন করেছিল। যদিও দীর্ঘ সময় সেই নিষেধাজ্ঞার যথাযথ প্রয়োগ নানাবিধ সীমাবদ্ধতায় আটকে ছিল, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই আইনি অবস্থান নতুনভাবে

পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সহস্রাধিক সুপারশপ ও খুচরা বিপণন কেন্দ্রে এখন পলিথিনের পরিবর্তে জুট, কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা কার্যকর হচ্ছে।

পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল ও সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক বিস্তার রোধে সরকারি পর্যায়ে নতুন গেজেট জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়কে সম্পূর্ণ 'একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক' মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে প্রবেশপথে কঠোর নজরদারি ও বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যাগ সরবরাহের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও দূষণমুক্ত প্রশাসনিক পরিবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার ৯০ শতাংশ হ্রাস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্যের ৮০ শতাংশ পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং নিশ্চিত করার একটি টেকসই লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। এই স্বপ্নদর্শী লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজন মাঠপর্যায়ে কঠোর প্রশাসনিক নজরদারি। আইনি কঠোরতা ও দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে তৃণমূলের পৌরসভা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান পরিবর্তন নিশ্চিত করাই হবে আগামীর মূল চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি সরকার 'জাতীয় ৩-আর (রিডিউস-রিইউজ-রিসাইকেল) স্ট্র্যাটেজি' ও 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দিচ্ছে।

তবে রাষ্ট্রীয় নীতির পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগও প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে উৎসভিত্তিক বর্জ্য পৃথকীকরণ (সোর্স সেগ্রিগেশন) ও 'ওয়েস্ট ব্যাংক' কার্যক্রম চালু হয়েছে; কুষ্টিয়া পৌরসভা তরুণদের সম্পৃক্ত করে তথ্যভিত্তিক প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিপিসিএল সাতটি ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ৩৮০ টন পিইটি বোতল রিসাইকেল করছে, আর কক্সবাজারে ব্র্যাক পরিচালিত প্ল্যান্ট মাসে প্রায় ৫ টন নিম্নমানের প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে নির্মাণসামগ্রী তৈরি করছে। বিশ্বব্যাংক ও UNOPS সমর্থিত 'PLEASE' প্রকল্পে ৫,০০০'র বেশি বর্জ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাদের বড় অংশই নারী; পাশাপাশি নদী থেকে ভাসমান প্লাস্টিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

একইভাবে, 'করডএইড বাংলাদেশ' ৫০০ জন বর্জ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদানসহ প্রায় ১,২০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছে। ঢাকায় 'গারবেজম্যান'র মতো প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপ এবং ফরিদপুরে 'প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ'র প্লাস্টিক পাইরোলাইসিস প্ল্যান্ট, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ০.৩৬ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জ্বালানি তেল ও কার্বন ব্ল্যাকে রূপান্তর করা হচ্ছে; প্রমাণ করছে, সঠিক পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্লাস্টিক বর্জ্যও অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে পারে।

আন্তর্জাতিকভাবে এখন প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক দিয়ে টেকসই পণ্য তৈরি এবং ডিজিটাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক 'প্লাস্টিক-রোড' প্রযুক্তিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণের কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

সর্বোপরি, প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা কোনো একক পদক্ষেপে সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশে প্লাস্টিক সংকট নিরসনে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এবং সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় মহাপরিকল্পনার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব বুঝে বিকল্প ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব: রাষ্ট্র কি করছে দেখার আগে, আমরা কি করছি তা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্লাস্টিককে পূর্বোক্ত উৎস থেকে সংকীর্ণ করে, বাংলাদেশ হতে পারে পরিবেশমিত্র ও উদ্ভাবনী দেশসমূহের এক মডেল।

*সহকারী পরিচালক (নগর পরিকল্পনা), আরইউটিডিপি, রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট, এলজিইডি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।

পরিবেশের সুরক্ষায় তরুণদের ভূমিকা

আহসান রনি*

মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সেই সম্পর্ক ক্রমশ একপাক্ষিক হয়ে পড়েছে। মানুষ নিয়েছে, প্রকৃতি দিয়েছে। আজ সেই দেওয়া-নেওয়ার ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু ও পানিদূষণ, বনভূমি ধ্বংস এবং প্লাস্টিক দূষণ মিলে পৃথিবী দিনকে দিন পড়ছে এক গভীর সংকটের মুখে। এই সংকট মোকাবিলায় যে প্রজন্মটি সবচেয়ে সক্রিয় ও সোচ্চার, তারা হলো উদ্দীপ্ত তরুণ সমাজ।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে তরুণদের সংখ্যা ১৩০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশেও মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী। এই বিশাল তরুণ শক্তি যদি পরিবেশ রক্ষায় সংগঠিত হয়, তাহলে পরিবর্তন অনিবার্য।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ স্রেফ তাত্ত্বিক কোন বিষয় নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। জার্মানওয়াচ প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের সর্বোচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় স্থান পাচ্ছে – ২০২১ সালের সূচকে ছিল ৭ম, সর্বশেষ ২০২৬ সালের সূচকে রয়েছে ১৩তম অবস্থানে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর পাশাপাশি বায়ুদূষণে ঢাকা বিশ্বের অন্যতম দূষিত নগরীর তালিকায় নিয়মিত স্থান পাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যাসহ দেশের প্রধান নদীগুলো শিল্প ও গৃহস্থালি বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্লাস্টিক দূষণ পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ৬৪৬ মেট্রিক টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যার মাত্র ৩৭ শতাংশ পুনর্ব্যবহার হয়। বাকিটুকু মাটিতে, নদীতে বা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়- বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ টন প্লাস্টিক পরিবেশে মিশে যায়।

একটি সাধারণ পলিব্যাগ পচতে সময় লাগে ৪০০ থেকে ১০০০ বছর। বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষেরও বেশি প্লাস্টিকের বোতল বিক্রি হয়। এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের মতে, সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক ২০৫০ সালের মধ্যে মাছের চেয়ে ওজনে বেশি হবে। এখন মানুষের শরীরে- রক্ত, ফুসফুস ও মায়ের বুকের দুধেও পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টন প্লাস্টিক পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়। তরুণদের পরিবেশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণ নিছক আবেগ নয়, বরং এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি যারা ভোগ করবে, তারাই আজকের তরুণ।

২০৫০ বা ২০৮০ সালে পৃথিবী কেমন থাকবে, সেটা তাদের জীবনকাল। তাই এই লড়াই তাদের কাছে বিমূর্ত নয়, অত্যন্ত বাস্তব। ২০১৮ সালে সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ একা সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে "স্কুল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট" শুরু করেছিলেন। মাত্র কয়েক মাসে সেই আন্দোলন "ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার" নামে ১৬০টির বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী একদিনেই ৪০ লক্ষেরও বেশি তরুণ রাস্তায় নামে।

সিঙ্গেল-ইউজ বা এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়াই বর্তমানে তরুণ আন্দোলনের কেন্দ্রে। বাংলাদেশে পলিব্যাগ আইনত নিষিদ্ধ হলেও কার্যকর বাস্তবায়ন হয়নি। এই শূন্যতায় তরুণরাই সামাজিক চাপ তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে প্লাস্টিক-মুক্ত ক্যাফেটেরিয়া তৈরি হচ্ছে, কাগজ ও পাটের ব্যাগ বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা "জিরো ওয়েস্ট" জীবনধারার চর্চা শুরু করেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রসৈকত ও নদীতীর পরিষ্কার অভিযানে তরুণদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনের উদ্যোগে গত কয়েক বছরে শত শত টন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই স্বেচ্ছাসেবক তরুণ। কুয়াকাটা, পতেঙ্গা ও সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায়ও এ ধরনের উদ্যোগ নিয়মিত হচ্ছে। উদ্যোক্তা তরুণরা পাটের ব্যাগ, বাঁশের তৈজসপত্র ও বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং তৈরি করে প্লাস্টিকের বিকল্প বাজারে আনছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "প্লাস্টিক-মুক্ত ক্যাম্পাস" গড়ার উদ্যোগ চলমান আছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ও গ্রিন সেভারস ও বিএসআরএম ফাউন্ডেশন উদ্যোগে ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলার নির্বাচিত ১০০টি স্কুলকে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ফ্রি মডেল স্কুল' গড়ার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন চলমান আছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন(বাপা) তরুণদের সম্পৃক্ত করে পরিবেশের নানান দূষণবিরোধী প্রচারণায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। তরুণ উদ্যোক্তাদের পাটজাত পণ্যের স্টার্টআপ আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান পাচ্ছে। বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের মাত্র ১১ শতাংশের মতো, যেখানে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। এই ঘাটতি পূরণে তরুণরা বৃক্ষরোপণ অভিযানে এগিয়ে আসছে। বর্তমান সরকার তরুণদের সম্পৃক্ত করে সারা দেশ জুড়ে তাঁদের প্রতিশ্রুত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষয়ক ক্লাবগুলো প্রতি বছর বর্ষায় হাজার হাজার গাছের চারা বিতরণ করে। শুধু রোপণ নয়, গাছের পরিচর্যা ও বেঁচে থাকার হার নিশ্চিত করতেও তারা কার্যকর ভূমিকা রাখছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে যাওয়াটা পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান শর্ত। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষেরও বেশি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে, যার অনেকটাই হচ্ছে তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকরা সাশ্রয়ী মূল্যে সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প, জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তি ও দূষণ মাপের অ্যাপ তৈরিতে কাজ করছেন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ পর্যবেক্ষণেও তরুণরা এগিয়ে- নদীর পানি ও বাতাসের মানের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে তরুণ বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

কোনো আন্দোলনই টেকসই হয় না যদি সমাজের বৃহত্তর অংশকে সঙ্গে না নেওয়া যায়। এই কাজেও তরুণরা এগিয়ে আছেন। স্কুল ও কলেজে পরিবেশ ক্লাব, সাইকেল র‍্যালি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাটক ও গানের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তরুণ কন্টেন্ট নির্মাতারা পরিবেশ সচেতনতার ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক ও ব্লগ প্রকাশ করছেন, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমে "নো প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ", "ক্লিন বাংলাদেশ" বা "গ্রিন ক্যাম্পাস" হ্যাশট্যাগে যে সকল পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তার পেছনে মূলত তরুণদের উদ্যোগই সিংহভাগ ভূমিকা রাখছে।

শুধু মাঠপর্যায়ে নয়, নীতিনির্ধারণের টেবিলেও তরুণদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ থেকে তরুণ প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পক্ষে ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের তরুণরা জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায্যতার দাবি তুলছেন। দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে তরুণরা পরিবেশ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করছে। তরুণদেও এত উদ্যম থাকা সত্ত্বেও কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ আছে। পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এখনো শহুরে ও শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ও প্রান্তিক তরুণদের এই আন্দোলনের মূলধারায় আনা জরুরি। এর পাশাপাশি, সরকারি পর্যায়ে তরুণদের পরিবেশ উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা দরকার। পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং পরিবেশ সুরক্ষায় তরুণদের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পরিবেশ শিক্ষার কার্যকর পাঠ্যক্রম চালু করা প্রয়োজন–যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু পরিবেশ সংকটের কথা জানবে না, বরং সংকট মোকাবিলার উপায়ও শিখবে। পাঠ্যবইয়ের পাতায় আটকে না থেকে এই শিক্ষা হওয়া দরকার হাতে-কলমে – মাঠে গিয়ে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে, গাছ লাগিয়ে। তাহলেই পরিবেশবোধ কেবল পরীক্ষার খাতায় নয়, শিক্ষার্থীর চিন্তায় ও আচরণে গেঁথে যাবে। একজন শিক্ষার্থী যদি ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে যে একটি পলিব্যাগ ফেলে দেওয়া মানে নদীকে একটু একটু করে মেরে ফেলা, তাহলে সে বড় হয়ে সেই কাজ করবে না এবং তার পরিবারকেও করতে দেবে না। পরিবেশ শিক্ষা তাই শুধু পাঠ্যবিষয় নয়, এটি একটি মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া–যা আগামী প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করবে।

এককভাবে তরুণদের পক্ষে পরিবেশ বাঁচানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্র, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও পরিবার- সবাইকে একই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তবে এটা সত্য যে পরিবর্তনের গতি এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ আসছে তরুণদের কাছ থেকেই।

*প্রধান নির্বাহী, গ্রিন সেভার্স।

শব্দদূষণ ও প্রতিকার

মো. বেলায়েত হোসেন*

'মানুষকে একদিন শব্দদূষণ মোকাবেলা করতে হবে কলেরা কিংবা কীটপতঙ্গ ঠেকানোর মতো সমান গুরুত্বের সঙ্গে'। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে নোবেল বিজয়ী জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কচ এ উক্তিটি করেন। বর্তমানে এ উক্তি কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিভিন্ন গবেষণা এবং বাস্তব চিত্র প্রমাণ দেয়। অদৃশ্য এ দূষণ পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, বাস্তুসংস্থান তথা জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। নগরায়ণ তথা বিশ্বায়নের আড়ালে এ দূষণ প্রকট হতে থাকে ধীরে ধীরে। কয়েকবছর আগেও যখন পরিবেশ দূষণ নিয়ে নগর পরিকল্পনাবিদ এবং গবেষকরা হৈ চৈ করছিলেন তখনও শব্দদূষণের বিষয়টি অন্তরালে রয়ে যায়। যা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিজ্ঞানের কল্যাণে দিনে দিনে এ নিয়ে কপালে ভাঁজ গবেষকদের। দুশ্চিন্তার অসম বোঝা ভর করেছে সচেতন মহলের মাথায়ও।

শব্দদূষণ মানুষের তৈরী নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিবেশগত সমস্যা; নগরায়ণের নতুন মহামারী। অসহনীয় দূষণে পাখি শূন্য নগরে ঘুম ভাঙ্গে এলার্মের শব্দে। তারপর কর্মস্থলে যাওয়া আসা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত শুনতে হয় বিকট শব্দ। রাতে চলাচল করা গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত শব্দে অভ্যস্ত আমরা। আর এ দূষণ অজান্তেই ধীরে ধীরে আমাদেরকে মৃত্যু ঝুঁকিতে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনের ওপর অপূরণীয় নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এ শব্দের উৎস হিসেবে আতশবাজি ও পটকা, মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, জেনারেটর, সুরযন্ত্র, পাবলিক এড্রেসিং সিস্টেম, সকল প্রকার মোটরযানের হর্ন, শিল্পকারখানা ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের শব্দসহ শব্দবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য বৈদ্যুতিক বা অন্যকোন যন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আরও বিভিন্ন উৎস যেমন- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় উচ্চ শব্দে বাজানো মাইক, রেল এবং আকাশ পথে ব্যবহৃত যানবাহন থেকে আসা শব্দেও প্রতিনিয়ত দূষণ ঘটছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনায় বিধিমালায় এসব উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দদূষণকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা মতে, মানুষ জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দদূষণ দ্বারা শ্রবণশক্তি হারানো তথা বধির হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভালো মানের ঘুমের জন্য রাতের বেলা শোবার ঘরে শব্দের মাত্রা ৩০ ডেসিবলের কম হওয়া উচিত। অথচ রাজধানীতে এবং বিভাগীয় শহরগুলোতেও শব্দের মাত্রা এর চেয়ে অনেক বেশি। যানবাহনে রাস্তায় ওভারটেকিং করার প্রতিযোগিতায় অযথা বার বার লেন পরিবর্তন করার প্রবণতা দেখা যায়। এ প্রতিযোগিতা হর্ন বাজানোর অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে শব্দদূষণ রোধে চালকের আচরণগত পরিবর্তন অনেক বেশি জরুরি।

শব্দদূষণ নীরব ঘাতক। শিশুদের কথা বলতে ও ভাষা বুঝতে অসুবিধা, স্মৃতিশক্তি দুর্বল তথা বুদ্ধি বিকাশের অন্যতম অন্তরায় এ দূষণ। এছাড়া এর প্রভাবে শ্রবণশক্তি হ্রাস, উচ্চ রক্তচাপ, হরমোনে ভারসাম্যহীনতা তথা শিশুদের সমষ্টিগত শারীরিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি, মানসিক চাপ ও উদ্বেগ, কাজে নিরুৎসাহিত করা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা তথা আচরণগত পরিবর্তনের জন্যও এদূষণ অনেকটা দায়ী। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও ঘুমের ব্যাঘাত, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ফুসফুসজনিত জটিলতা, মাথাব্যথা, খিটখিটে মেজাজ, কাজের মানের অবনতি, বধির হওয়া, স্মরণ শক্তির হ্রাস শব্দদূষণের অন্যতম কারণ। শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষকে বর্তমানে দীর্ঘক্ষণ কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে কিংবা কথা বলতে দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত এ অভ্যাস নতুন প্রজন্মের জন্য বিপজ্জনক। এতে শারীরিক ও মানসিক নানান নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও শিশুদের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৫ এ উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি যেমন-লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র, পাবলিক এড্রেসিং সিস্টেম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তবে কোনক্রমেই রাত ১১ ঘটিকা পর্যন্ত, ক্রমাগত ০৩ (তিন) দিন এবং সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টার বেশি সময়ের জন্য এসব যন্ত্র ব্যবহারে অনুমতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবচিত্র হচ্ছে অধিকাংশই অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এছাড়া ব্যবহৃত যন্ত্রে উৎপন্ন শব্দের মাত্রা যাতে ৯০ ডেসিবলের মধ্যে। অথচ এ মাত্রা প্রায়ই অনিয়ন্ত্রিত। বিধি ৬ এ বলা হয়েছে যে- মাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন, হাইড্রোলিক হর্ন, মাল্টি টিউন হর্ন ও সহায়ক যন্ত্রাংশ প্রস্তুত, আমদানি, মজুদ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার করা যাবে না। অথচ এ নিয়মের যে ব্যত্যয় ঘটছে, তা বাস্তব চিত্র বলে দেয়। আবাসিক এলাকায় রাত ৯ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ থাকলেও মানা হচ্ছে কতটুকু? যানবাহন ব্যবহারকারী চালকদের বার বার লেন পরিবর্তন এবং অপ্রয়োজনীয় হর্নের কারণে ঘটছে দূষণ। বিধি ৮ এ পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ সৃষ্টিকারী পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে- নতুন বছর উদযাপনে কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে মনে হয় না।

এক্ষেত্রে সরকারের নানান বিধিনিষেধ দিনের বেলায় শোনা গেলেও মধ্যরাতে তার বিপরীত চিত্র প্রমাণিত হয়। মধ্যরাতে অনবরত আতশবাজি এবং পটকার ফুটানোর সময় বাসা থেকে শুরু করে হাসপাতালে থাকা শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং রোগীদের কথা অবিবেচ্য থাকে। সবচেয়ে বেশি নির্মমতা টের পাওয়া যায় শহরে গভীররাতে আতঙ্কিত পাখিদের দিগ্বিদিক ছোটাছুটির দৃশ্য দেখে। নিরব এলাকায় শব্দের মাত্রা দিনের বেলায় ৫০ ডেসিবল এবং রাতে ৪০ ডেসিবল হওয়ার কথা। আবাসিক এলাকায় তা যথাক্রমে ৫৫ ডেসিবল এবং ৪৫ ডেসিবল। এ বিধিতে নিরব এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সেসব এলাকায় এমন শব্দের নিষিদ্ধের বিষয় রয়েছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের কাজ করা জরুরি।

বিধি ৯ এ শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। শিল্প এলাকায় দিনের বেলায় শব্দের মাত্রা ৭৫ ডেসিবল এবং রাতে ৭০ ডেসিবল এর মধ্যে রাখার বিধান থাকলেও বাস্তবচিত্র আমাদের অনুমেয়। মূলত অধিকাংশ শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শ্রবণশক্তি হ্রাস ছাড়াও নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগতে থাকে। যদিও বিধি ১৫ তে শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দূষণ থেকে বাঁচাতে সুরক্ষা তথা নিরাপত্তার কথা উল্লেখ রয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে মালিক তথা কর্তৃপক্ষের আরও সচেষ্ট হওয়া বোধ করি। বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে কিংবা জরুরি বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। জেনারেটর চলাকালীন প্রচন্ড শব্দ ও কম্পন হয়ে থাকে। যা স্বাভাবিক শ্রবণ মাত্রার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। দীর্ঘসময় জেনারেটর চলতে থাকলে মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস শেষে বধির হতে পারে। তাই অতিরিক্ত শব্দ নিয়ন্ত্রণে জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাউন্ড প্রুফিং ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে বিধি ১০ এ বলা হয়েছে। আর শব্দদূষণ রোধ করতে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী যেমন- সৌরবিদ্যুৎকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে রাস্তা ও ভবনের নির্মাণে দিন-রাত বিবেচনা করা হয় না। পাইলিং কাজ, ইট ভাঙ্গার যন্ত্র, সিমেন্ট মিক্সার থেকে বিকট শব্দের কারণে আশেপাশে কোন কিছু শোনা যায় না। অথচ বিধির ১২ নম্বরে নীরব এলাকায় দিনে ও রাতে এবং আবাসিক এলাকায় রাতে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আবাসিক এলাকা ও আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হতে ৫০০ (পাঁচশত) মিটারে সন্ধ্যা সাতটা হতে সকাল সাতটা পর্যন্ত এসব মাধ্যমে শব্দদূষণ করা যাবে না।

সড়ক পথের যানবাহন এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শব্দ ছাড়াও নৌপথে চলাচল করা যানবাহনের কারণেও দূষণ হচ্ছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় জলজ পথে যোগাযোগ, যাতায়াত তথা যানবাহনের চলাচলে সৃষ্ট দূষণ উল্লেখযোগ্য। এ প্রকার দূষণ জলজ জীবনে ব্যাপক ক্ষতির কারণ। ট্রলার, জাহাজসহ অন্যান্য ইঞ্জিন চালিত জলযান নদী, সাগর পথে যখন চলাচল করে; তখন ইঞ্জিনের প্রচন্ড শব্দে পানিতে বসবাসকারী নানা জাতের প্রাণীর প্রজনন, খাদ্য সংগ্রহ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি তথা জীবন চক্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তফসিল- ৩ এ জলজপথে শব্দদূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ ডেসিবল। নদী এবং সাগরে নির্দিষ্ট সময় ও এলাকায় মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলজ জীবন তথা খাদ্যচক্র বাঁচাতে এক্ষেত্রে আরোপিত নিয়মগুলো মেনে চলা দরকার।

সংরক্ষিত বন এলাকায় শত শত জাতের পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ তথা বন্য প্রাণীর আবাস। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। অথচ এ ধরনের বন যেমন- সুন্দরবনের গভীর অঞ্চলেও উচ্চ শব্দে যাত্রীবাহী জাহাজ, মাছ ধরার ট্রলার অবাধে চলাচল করছে। এতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তিতে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির সংবাদ সামনে আসছে। তাই এ বিষয় গুরুত্বসহকারে ভাবনার সময় এসেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন মানুষ যদি ২০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ উভয় কানে ভালোভাবে শুনতে না পায়, তবে তিনি শ্রবণশক্তি হারাচ্ছেন বলে বিবেচনা করা হয়। যখন কোন ব্যক্তি ৩৫ এর বেশি ডেসিবল মাত্রার কোনো শব্দ শুনতে পায় না, তখন তিনি দিনে দিনে শ্রবণ অক্ষম হচ্ছেন। মানুষকে শ্রবণশক্তিতে অক্ষম করছে এমন শ্রবণশক্তি হ্রাসে ৮০ ভাগ মানুষের বসবাস নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রবণশক্তি হ্রাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৬০ বছরের অধিক বয়সী মানুষদের মধ্যে ২৫ ভাগেরও বেশি মানুষ এ অক্ষমকারী শ্রবণশক্তি হ্রাসে আক্রান্ত। বলা বাহুল্য যে, উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার তথা সচেতনতা এবং নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় সঙ্গত কারণেই অনেক বেশি।

শ্রবণশক্তি হ্রাস মৃদু, মাঝারি, মাঝারি-গুরুতর, গুরুতর বা চরম হতে পারে। এতে একটি বা উভয় কান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সাধারণ বা উচ্চ শব্দের কথাবার্তাও শুনতে সমস্যা হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে শ্রবণশক্তি হ্রাস ব্যাক্তি যারা মৃদু থেকে তীব্র সমস্যার দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা কথ্য ভাষা এবং শব্দ শোনার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন-ককলিয়ার (Cochlear), ইমপ্লান্ট(Implant) ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সহযোগিতা নিয়ে উপকৃত হতে পারে। যারা পুরোপুরি বধির তারা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট (Cochlear Implant) এবং ভাষা চিহ্ন ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারেন।

*কবি ও প্রাবন্ধিক

নীরব ঘাতক প্লাস্টিক: দূষণ রোধে আধুনিক সমাধান ও আমাদের করণীয়

সাধন সরকার*

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্লাস্টিক এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। সস্তা, হালকা, সহজে বহনযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুমুখী ব্যবহারের কারণে আজ প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে! ছোট শিশুদের পানির বোতল থেকে শুরু করে বড়দের ব্রাশ- সবখানেই প্লাস্টিকের রাজত্ব। ব্যবহারে সুবিধার কারণে প্লাস্টিকের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বিজ্ঞানের আশীর্বাদ প্লাস্টিক এখন বড় অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাস্টিক এমন এক অপচনশীল রাসায়নিক পদার্থ যা বিলীন হতে শতাব্দীর পর শতব্দী লেগে যায়। স্থলভাগ, নদ-নদী থেকে মহাসাগর সর্বত্র আজ প্লাস্টিকের উপস্থিতি। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের বায়ু, মাটি, পানি, জীববৈচিত্র্য এবং সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে দূষিত করে তুলেছে। সময় এসেছে প্লাস্টিক দূষণ রোধে আধুনিক, টেকসই ও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার।

প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা:

প্লাস্টিক বর্জ্য শুধু পরিবেশের জন্য মহাবিপদ বয়ে আনে না, এটা খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউনেপ) তথ্য মতে, প্রতিবছর কোটি কোটি টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে, যার মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ রিসাইকেল করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি সিংহভাগ প্লাস্টিকের ঠিকানা নদ-নদী, খাল, বিল, উন্মুক্ত জলাশয়, সাগর ও মহাসাগর। প্লাস্টিক এমন এক ধরনের রাসায়নিক পলিমার, যা প্রাকৃতিকভাবে মিশে যেতে ৪০০ বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। গবেষণা বলছে, প্লাস্টিক বিলীন হওয়ার পূর্বে সূর্যের আলো ও ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। এই ক্ষতিকর কণা মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে কোন না কোনভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। যা মানবদেহে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, ক্যানসারের ঝুঁকিসহ নানা জটিলতা তৈরি করছে। প্লাস্টিক মাটির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে। শহরের স্বাভাবিক ড্রেনেজ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করছে। দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিক জমে থাকার কারণে মাটির নিচের স্তরে পানি চলাচলে বাধা তৈরি হচ্ছে।

প্লাস্টিক দূষণের আধুনিক সমাধান:

প্লাস্টিক এখন বৈশ্বিক সমস্যা। প্রথাগত উপায়ে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। প্লাস্টিকের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে সমন্বিত, বাস্তবসম্মত, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দূষণের আধুনিক উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো:

১। 3R (Reduce, Reuse, Recycle) নীতির বাস্তবায়ন: 3R নীতি এমন একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যেখানে প্লাস্টিকের উৎপাদন থেকে শুরু করে বর্জ্যে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পরিবেশের ক্ষতি কমিয়ে আনে।

3R নীতির প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো Reduce। অর্থাৎ প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহারকে 'না' বলতে হবে। সর্বস্তরে সচেতনতা তৈরি হলে প্লাস্টিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমে আসবে। ব্যবহার কমে আসলে উৎপাদনও কমে যাবে। ফলশ্রুতিতে বর্জ্যের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম হবে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বা সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। বাজারে কেনাকাটার সময় পাটের ব্যাগ ও কাপড়ের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

একটি প্লাস্টিক সামগ্রী একবার ব্যবহার করে ফেলে না দিয়ে বারবার ব্যবহার করার প্রক্রিয়ায় হলো Reuse। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় আমরা প্লাস্টিকের ব্যাগ, পানির বোতল, কোমল পানীয় জার ব্যবহার করেই ফেলে দিই। একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ বা সামগ্রী বিভিন্ন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া বর্তমান সময়ে কোনো কিছুই ফেলনা নয়। প্লাস্টিকের সামগ্রী দিয়েই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পকর্ম। প্লাস্টিকের বালতি বা বোতলে অনায়সেই গাছ লাগানো সম্ভব। শো-পিস, কলমদানিসহ নানা উপকরণ বানানো হচ্ছে ফেলনা প্লাস্টিক দিয়েই। 3R নীতির শেষ ধাপ হলো Recycle। রিসাইক্লিং বা বর্জ্যকে নতুন কাঁচামালে পরিণত করা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কমবেশি প্রচলিত।